ujari

# অঞ্জলি ১৪১৩

# Anjali

Baishakhi Issue, 2006

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবস শর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

## Pujari Executive Committee 2006

**President** - Sudipto Ghose
**Vice Presidents** - Anindya De & Sanjay Chatterjee
**Secretaries**- Pabitra Bhattacharya & Prabir Nandi
**Cultural Secretary** - Prabir Bhattacharyya
**Treasurer**- Sushanta Saha
**Publication Secretary** - Sutapa Datta
**Webmasters** - Raja Roy & Prabudha Pal

---

*Pujari Board of Directors and Executive Committee heartily appreciate the involvement and enthusiasm of all the contributors, volunteers and participants for supporting this event. Without their support and contribution, Baishakhi would not have been possible.*

## Upcoming Pujari Events:

**Durga Puja: 30th Sept & 1st Oct 2006**
**Lakshmi Puja: 6th Oct 2006**
**For more info, please visit our updated website: www.pujari.org**

# শান্তিনিকেতনে বর্ষবন্দনা ও রবীন্দ্র জন্মোৎসব

*ডঃ সুমিত্রা খাঁ, শান্তিনিকেতন*

নববর্ষ। বাঙালীর নানান উৎসবের মধ্যে এক অন্যতম উৎসব। এক সময় শিক্ষিত বাঙালীরা ইংরাজী নববর্ষের অনুকরণে নববর্ষ পালন করতো। সমাজে মানুষের মধ্যে বন্ধন স্থাপনের উদ্দেশ্যেই মহর্ষি দেবেনদ্রনাথ ঠাকুর আদি ব্রাহ্ম সমাজে এই উৎসবের প্রবর্তন করেন। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে নববর্ষের উৎসবকে পূর্নতা দিয়েছেন, মিলন ও ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত করে। নববর্ষের অনুষ্ঠানের মধ্যেই ফুটে ওঠে দেশবাসীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের এক দৃঢ় পদক্ষেপ।

১৩০৯ সালের ১লা বৈশাখ আশ্রমে নববর্ষের প্রথম অনুষ্ঠানটি পালন করা হয় - যখন শালবীথি, বকুলবীথি, কৃষ্ণচূড়া সেজে ওঠে প্রকৃতির বুকে। বৈতালিকের গান - 'ভেঙ্গেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোর্তিময়....' ছাত্রছাত্রীদের আশ্রম পরিক্রমার মধ্যে দিয়েই চারপাশ ভরিয়ে তোলে। তারপর সকাল ৭ টায় উপাসনা, কাঁচ-মন্দিরে বৈদিক মন্ত্রপাঠে। গুরুদেবের লেখা পাঠ এবং গান বাতাসে ভরে ওঠে, সৃষ্টি করে এক অপরূপ পরিবেশ। এ সময় মন্দির চত্তর বন্ধু-বান্ধব, বাঙালী-অবাঙালী, দেশী-বিদেশী সকল মানুষের এক মিলনস্থল হয়ে ওঠে যা স্মরণ করায় - 'যত্র বিশ্বম্ ভবত্যেকনীড়ম্'। ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা নিজে হাতে কার্ড এঁকে পরস্পরকে দেয়। তাছাড়া গুরুজনদেরও প্রণাম করে - যেন 'প্রীতির বন্ধনটি অক্ষয় থাকে।'

মন্দির উপাসনার পর সকাল ৮-টা নাগাদ আম্রকুঞ্জে শুরু হয় রবীন্দ্রজন্মোৎসবের অনুষ্ঠান। শান্তিনিকেতনে ১৯১০ সাল থেকে, যখন কবির ৪৯ বছর বয়স, তখন থেকেই ঐ দিন জন্মোৎসবের উৎসব পালন করা হয়ে আসছে। নাচে, গানে, আবৃত্তিতে ভরে ওঠে সেই অনুষ্ঠান -'হে নূতন, দেখা দিক আরবার, জন্মের প্রথম শুভক্ষণ...'। এই উপলক্ষে কবি স্বয়ং তাঁর নিজের লেখা নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে ও অভিনয় করেছেন। সমগ্র আশ্রমবাসী, ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক-কর্মী সকলেই ঐ দিনটিকে এক ঐতিহ্যপূর্ণ দিনে পরিণত করে তোলে।

২৫-শে বৈশাখ কবির জন্মদিন হওয়া সত্ত্বেও আজও ১লা বৈশাখ আশ্রমে কবির জন্মদিন পালিত হয়। এর বিশেষ কারণই হলো শান্তিনিকেতনের রুক্ষ্ম কাঁকুড়ে মাটি, যা চৈত্র-বৈশাখের দাবদাহে তপ্ত হয়ে উঠে, জল শুকিয়ে যায়, তাই ১লা মে গ্রীষ্মের ছুটি ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিলেন গুরুদেব। ১৯৩৬ সাল থেকেই কবির জন্মোৎসব ১লা বৈশাখেই পালিত হয় শান্তনিকেতন আশ্রমে।

ক্ষিতিমোহন লিখেছেন, 'গুরুদেব একবার ভাবিয়া চিন্তিয়া প্রস্তাব করিলেন গ্রীষ্মের ছুটি জলের দৈন্য বুঝিয়াই স্থির করতে হইবে। তিনি বলিলেন, ১লা বৈশাখ নববর্ষ। সেইদিনই আমার জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হউক। তারপর প্রয়োজন মত যোগ্য দিনে গ্রীষ্মের ছুটি দেওয়া হউক।'

রবীন্দ্রজন্মোৎসব অনুষ্ঠানের আগে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক-কর্মী, অতিথি, সকলকেই মিষ্টমুখ করানোর ব্যবস্থা থাকে। এরপর আম্রকুঞ্জ, যেখানে অনুষ্ঠানটি হয়, সেই জায়গাটি সুন্দর আল্পনায় যেমন রেঙে ওঠে তেমনই পাঠে, গানে, অবৃত্তিতে, শ্রদ্ধায়, ধূপের ধোঁয়ায় এক অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

জন্মোৎসব পালনের উদ্দেশ্যে কবির এক সুন্দর মনোভাবের ছবি ফুটে ওঠে ক্ষিতিমোহনের লেখায় - '২৫শে বৈশাখ কবি পারতপক্ষে আশ্রমের বাইরে থাকতে চাইতেন না।' তিনি বলতেন -'অন্য কোথাও থাকিলে আমার মনে হয় আমি বৃদ্ধ। এইখানে এইসব শিশুদের মধ্যে থাকিয়া আমি যেন আমার হারানো শৈশবকে ফিরিয়া পাই....'

এই জন্মোৎসবকে উপলক্ষ করেই কবির চিত্তের উচ্ছ্বাস ফুটে ওঠে নানান কবিতায়, গানে, নাটকে এবং সাহিত্যের নানান ধারায় যা আজও পূর্ণ মর্য্যাদায় প্রকাশ পায় কবির জন্মদিনে। এ যেন গঙ্গা জলে গঙ্গা পূজার মতই সমগ্র দেশবাসীর শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ।

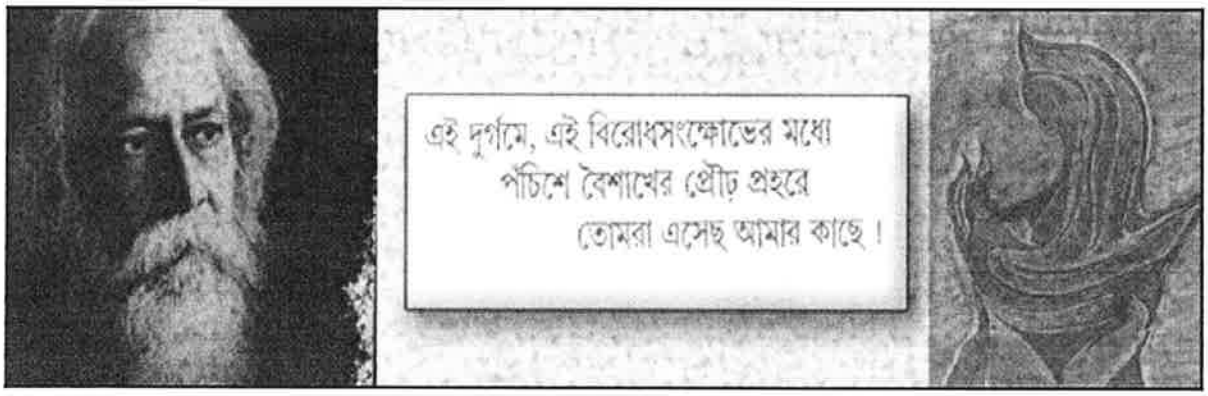

# ভুলি নাই কিছু

*গীতা সেন*

জীবনের এই পড়ন্ত বেলায় জানলা দিয়ে
মাঝে মাঝে উঁকি মারে বিগত শৈশব,
স্মৃতির সমুদ্রে ওঠে উথাল পাতাল ঢেউ।
শুনতে পাই বর্ষণ মুখর দিনের
পাখির ডানা ঝাপ্টানোর শব্দ,
দেখতে পাই রামধনু আঁকা
প্রজাপতির চঞ্চল নাচের ছন্দ,
মনে পড়ে যায় -
চেনা অচেনা নানা ফুলের গন্ধ।

স-ব, সব মনে পড়ে যায় -
নীল আকাশের পথ চেয়ে উড়ে যাওয়া
সাদা বকের সারি -
বকুল ফুলের মালা গেঁথে
নিজের চুলে পরা,
আরও আরও কত কি!

ঘাস চাঁপার মাথায় মাথায়
সোনালী রদ্দুর আর গোলাপী ফুলের হাসি -
হারিয়ে যাওয়া খেলার সাথীদের
সমবেত গলায় গাওয়া গানের সুর।

কাঁচের গ্লাস ভেঙে ফেলে
মায়ের কাছে বকুনি খাওয়া,
ভাইবোনের সাথে নানা খুনসুটির কথা।
কাঁচা আমের ভাগ নিয়ে দলাদলি,
খরগোশের ছানা নিয়ে গলাগলি।
পড়া বলতে না পেরে মাস্টারমশাইয়ের
বকুনি আর কানমলা,
স-ব সব আজ মালা হয়ে দোলে
এই ঘোলাটে চোখের সামনে -
ভুলি নাই ছোট্ট ছোট্ট সুখ দুঃখ,
অনন্দ- বেদনা।

আজ মনে হয় শৈশব বড় সুন্দর -
বড় পবিত্র,
ঠিক যেন মায়ের চোখের
মমতার আলো।
আর তো ফিরে পাবোনা সেই শৈশব,
যা চিরতরে হারিয়ে গেছে।

# দূরে, অনেক দূরে

*রূপকুমার কর*

হিমঝরা চাঁদনী রাতে
হাসুহানার দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে
মুখরিত ছিলে তুমি,
আমি সারাক্ষণ দেখেছি,
স্বচ্ছ চোখের পাতার ভেতরে;
সাদা ওভারকোট চড়িয়ে রাত্তির
সর্বক্ষণ আমাকে অভয় দিয়েছে,
আমার পাশে দাঁড়িয়ে।
চার্বাকের মতো আমিও ঐ দিন
মহিমাময় ঈশ্বরের করুণা ও দয়ার
আস্বাদন অনুভব করেছিলাম।
শেষরাতে ঘুমের সাথে ষড়যন্ত্র করে
পালিয়ে গেল বিশ্বাসঘাতকা রাত্তির;
আর তুমিও সূর্যের ভয়ে
শিউলিঝরা ভোরের বিচ্ছেদ-বেদনা
চোখের পাতায় এঁকে দিয়ে
হাসুহানার সাথে মিলিয়ে গেলে
দূরে -- অনেক দূরে।।

# ব্রজবুলি কথা

*সুতপা দাস*

ঘন কালো মেঘে আকাশ ঢাকে
গুমরু গুমরু ডমরু বাজে
ভ্রমর কৃষ্ণ কালো এলোচুলে
রাধা ভাবে মাতোয়ারা -

'কোথা বাজে ঐ মধুর বাঁশরী?'
ডাকিছে সুর তারে, খুঁজে খুঁজে ফিরি -
গৃহ কাজ ফেলে, আবেশে বিহ্বলা,
মাতাল সুরেতে উদাস উতলা -
ত্বড়িৎ গতিতে ছুটে চলে পথে
শ্যাম সোহাগিনীরাধা।

নুপূরের ধ্বনি সুমধুর বোলে
ছন্দ তুলিছে বাঁশরীর সুরে -
'কোথা বনমালী, বংশীধারী
দাও তুমি মোরে দেখা'।

# অদেখার দেখা

*জবা চৌধুরী*

রোজ তোমার করে দেখি,
আজ তুমি দেখো আমার মতো করে।
তোমার নিত্যকালীন অভ্যাসের দেখা,
প্রয়োজনে, অযাচিতভাবে, পরিমিত সময়ে।
মূল্য বোঝাই কেমন করে ?
আজ তুমি আমার দেখায় দেখো প্রাণভরে।

তোমার সীমাবদ্ধতা আমাকে যেন ভাবায়।
যে দেখার প্রয়োজনে নিত্য আমাদের দেখাশোনা
হঠাৎ না দেখার উপলব্ধিটা কি খুবই সুখের?
বোধহয় আবার ভুলে যাবে
না দেখার পালা শেষ হলে !

তবুও তো এ আমারি একান্ত ব্যক্তিগত জয়।
যাকে দেখার মাঝে কোনো প্রাপ্তি নেই
অদেখার মাঝে চিরঅপ্রাপ্তির বোধটা যেন প্রবল ।
এ দেখা ভালো লাগার,
না মন্দ লাগার?

বোধহয় কোনোটাই নয় ।
সাময়িক দূরত্বের বৈষয়িক ব্যস্ততায়
জীবনের নিয়মিত আশংকায়
এ যে অভ্যাসের দেখা।
মূল্য বোঝা যায় না দেখাতে ।
তাই তো দেখবো বলে তোমায় দেখি না,
দেখিনা সুন্দর অসুন্দরের পরকাষ্ঠায়
যখন না দেখার হতাশায়
আমাকে হারাও বারেবারে
সেইদিন হয়তো বা এক মুহূর্তের মাঝে বোঝা যায়
মূল্যবিহীন এই নিত্য দেখায় লুকিয়ে আছে -
না দেখার অমূল্য বেদনা ।

# ইচ্ছা

*শঙ্কর মুখার্জী*

এই বছরের প্রথম থেকেই,
চাইছি আমি হাসতে,
হাসতে চেয়ে হাসির কথা,

হাসতে চাওয়ার অর্থে।

চাইনা কারো চিন্তা আমার,
চাইনা কারো মাথা,
চাইনা আমি টাকাকড়ি,
চাই যে হাসতে সদা।

হাসতে চিইছি ভীষণ ভাবে,
এখন তোমরা হাসাও,
হাসবো আমরা সবাই মিলে,
হাসির কথা জোগাও।

# কাঁটা তারের বেড়া

*ঋত্বিকা কর*

তুমি ছিলে প্রাণের মাঝে,
ছিলে মনের কোণে,
ছিলে তুমি সেথায়,
যেথা ব্যঙ্গমা দিন গোনে।
রূপকথারই রাজ্যে যখন
করতেম বিচরণ,
সুখ সাগরে ডুব দিয়ে যেথা
কেটেছে সন্তরণ।
তুমি ছিলে সেইখানেতে
সুখ স্মৃতিময় বনে,
তুমি ছিলে প্রাণের মাঝে
ছিলে মনের কোনে।

আজকে তুমি এক কূলেতে,
আমি অন্য কূলে।
মাঝখানেতে দুলছে নদী,
উঠছে যে জল ফুলে।
অশ্রুধারা সঙ্গী শুধু,
রয়েছি একেলা
প্রতিনিয়ত তোমার জন্য
রচি বিরহের বেলা।

আমাকে আজ এ জগতে
সবাই গেছে ভুলে।
আজকে তুমি এক কূলেতে,
আমি অন্য কূলে।।

তোমার আমার মাঝাখানেতে
আমার নিজের ছোট্ট জগৎ
শূণ্য দিয়ে ভরা।
নেইকো সেথা হাসি-ঠাট্টা
আনন্দময় গান,
সব পাখি আজ উড়ে গেছে,
চারিদিক শুনসান।
আজকে আমর ভগ্ন হৃদয়,
শুকনো পাতায় মোড়া।
তোমার আমার মধ্যেখানে
কাঁটা তারের বেড়া।

# প্রতীক্ষা

*জবা চৌধুরী*

দীঘির পাড়ে বসে সূর্য ওঠা দেখার ছলে
যেদিন তোমায় প্রথম দেখলাম--
সূর্যোদয়কে ম্লান করে দিয়ে
তুমি জয় করে নিলে আমার মন।
সেই থেকে শুরু আমাদের নিত্য দেখাশোনা,
কথা দেয়া আর কথা নেয়ার পালা।

আমার চারপাশে অবিরত চলতে থাকলো
আনন্দের মেলা। জীবন যেনো মধুর সাজে
সাজানো এক ক্যানভাস। আর আমি হারিয়ে
গেলাম ওই লাল, নীল, সবুজের মেলায়।

তারপর হঠাৎ একদিন আমার স্বপ্নের আকাশে
ভেসে এলো এক টুকরো কালো মেঘ। আর
ক্রমে ক্রমে তা ঢেকে দিলো আমার রঙীন ক্যানভাসকে।
খবরটা তুমি নিজের মুখেই দিলে আমায় 'ব্লাড ক্যান্সার'।
আর আমি স্থবিরের মত দাড়িয়ে শুনতে লাগলাম
বুকের ভেতর পাথর ভাঙার অবিরাম শব্দ।
তারপর আর কিছু মনে নেই-----।

বৈচিত্র্যহীন বহু যুগ পেরিয়ে আজ আমি বার্ধক্যে
দীঘির পাড়টা বড় বড় গাছে ছেয়ে গেছে আজ
অতীতের কোলাহল সব শান্ত হয়ে
শুধু রয়ে গেছে সুগভীর নি:স্তব্ধতা।
যখন দিনশেষে পাখীরা সব পাড়ি দেয়
ক্লান্ত ডানায় ভর করে আপন নীড়ে
অপলক সেই পথে তাকিয়ে মনে পড়ে--
কথা ছিলো কত শত এ জীবনে পূর্ণ করার
শুধু শূণ্য ডালা হাতে প্রহর গুনছি
এ জীবনের অস্তাচলে সূর্য নামার।

# Half-Way Around The World In Thirty Days

*Asit Narayan Sengupta*

The big steamboat made a few melancholy yet majestic 'boo-o-o-o' sounds and slowly moved away from the coast of India, into the dusk of the great unknown. We, my three friends and I, waived at the weeping faces of our loved ones as they waived back from the steadily disappearing coastline of Bombay. With tears filling up our eyes, we sought the security and comfort of our hammocks in the Dormitory, the cheapest accommodation on the ship. That was August 12, 1958, a day which remains etched in my memory forever. Thus began a voyage which was never to be repeated in my life, for within a few years aviation replaced ocean-voyage almost totally.

As the boat tossed us back and forth and side to side, we, like any new ocean-goers, were fast overcome by a nasty experience called 'sea-sickness'. Fortunately, a newly found friend, who had been there before, led us to the decks. Lo and behold, the exhilarating and strong sea-breeze, together with the view of the high rolling waves, cured us in no time. Thereupon we even started enjoying our sea voyage. This was a 11,000 ton ship, a rather modest one, belonging to the P. & O. Line. It had no high-flying lobby, no shops and no glittering decor, but we were served generally familiar food .One could help oneself freely with red wine from a few wooden barrels on the deck, but I was not a convert yet. Drinking of alcohol in any form was, by and large, a no-no for most in India.

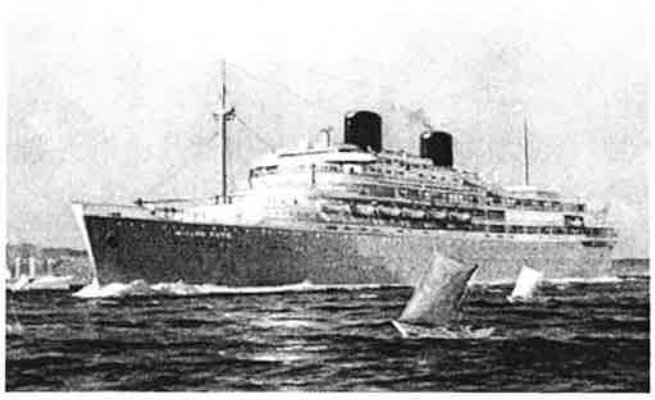

Going abroad was a rarity and privilege in those days and even rarer was air travel. The least expensive way was to sail on water and take a train or a bus on land. And why not! People were rather unhurried. There were no p.c.s (and no viruses), no hand-held calculators, no internets, no on-line dating, no TVs no remotes, no cell phones, no recorded-messages with never-ending choices and, imagine, no freeways! Just think of life without these indispensables! But wait. There was plentiful opportunity to socialize, to play indoor and outdoor games and to have elaborate feasts and festivals. Almost all participated. There was no crowding of the streets by people or vehicles. Kolkata was clean, as was Bombay. There was no air or noise pollution. Streets were washed regularly. Footpaths were not taken over by vendor-shacks. They were for walking. I used to hop on a tramcar or the upper-deck of a double-decker bus and at times was the only passenger! On a summer night it was a great pleasure when the bus or tram would speed through uncrowded Chowringee, the great maidan or Dalhousie Square (now B.B.D. Bag). And there were movie houses and movie houses, patronized devotedly and regularly by young and old alike, even on the night before the final exam! Speaking of exams, there were no multiple-choice questions and we had to write volumes and nad to master the art of memorizing and speed-writing starting from the very childhood.

My HOD at the most prestigious Bengal Engineering College was an American. So were my thesis guide and another visiting professor. We readily learnt American English and courtesies, like opening the door for a lady. I remember well how, when we worked all night in our studios, our thesis advisor and his wife would bring trays full of goodies. Later in USA I returned the favor to my own students. Two years after graduating I was offered a lecturer position at N.C. State University in Raleigh. When I broke the news to an Architect class-friend over the famed sponge rosogollas at

K.C.Das' on Chowringee, he confided that he too was going. We shared all our findings about booking a passage and the like. It cost Rs. 3000.00 for the all-inclusive one-month trip and we were allowed $ 50.00 at Rs. 5.00 per dollar! I also remember being given a book "Going to USA ", which told us never to forget that each of us was an Ambassador of India and behave accordingly. I never did forget.

Now back to the ship. After three days on the Arabian Sea it touched the Port of Djibouti, at the narrow entrance to the Red Sea. We were allowed to disembark and visit the dock-side market, our first landing on another continent. Later, after about two days through the Red Sea, which did look reddish because of some algae in the water, we reached Port Suez, and took a tour bus to the Great Pyramids, a wonder among wonders, built for the after-lives of the god-kings. The mysterious lion-king, the Sphinx, looking into the infinity, seemed to make a connection with the eternity. Even today no one knows for sure how a 480 ft. tall structure, equaling a 50 storey building, was built about 4500 years ago, when there was no electric power to drive an elevator or a tower crane. Many years later I revisited and climbed the oblique tunnels inside, leading to the burial chambers. Our next wonder was a slow trip through the 100 mile long and one-way Suez Canal, which brought the entire East closer to the West by some 6000 miles. Now we were in the Mediterranean Sea, a rather calm body of water. The exciting event, after another three days, was landing in Marseilles on the famed "Cote d'Azour " or the Blue Coast, the playground of the world's rich and famous, which we were not .

But here we visited a most innovative apartment building designed by one of our heroes, Le Corbusier, who was invited by Jawaharlal Nehru to plan the new capital city of Chandigarh. We took a night train to Paris, perhaps the most beautiful of all large cities. Even though it has the most elaborate 'Metro" system in the world, we, being total strangers, took a 'safe' whirlwind tour by a bus and were overwhelmed by the Eiffel Tower and the beautiful River Seine with its many bridges. At the Station we had a difficult time in getting drinking water. It was sold only in bottles and at the price of wine. With only $ 50.00 in our pockets we were not about to squander it away. Since we spoke not a word of French, our desperate sign language finally persuaded a disbelieving waiter to serve us water from a tap! I visited Paris many-a-time in later years and my halting French made things rather easy. From Paris we took a train to the steamer port of Callais.

We crossed a strangely rough but narrow English Channel by a large steamer, which also carried cars and many sea-sick passengers, whom we, by now seasoned travelers, watched with amusement and offered advice as to how to recover. From Dover, the steamer port on the other bank, we took a train to London, after which Kolkata, for many years the capital of India, was modeled, and which in turn was the capital of the mighty British Empire, to which India belonged when I was only a young boy. The stigma of being under foreign rule was no more. We enjoyed a few days of stay in the city, whose appearance spoke of discipline, history and preservation at every turn. We stayed in a family-run bed-n-breakfast. Here you would miss your breakfast if you would arrive at the table even one minute late! Also thanks to the two-way corridor switches you had to run fast to and from the common-for-all bathroom, otherwise the light would go out at half-way point. When it comes to food the stark difference between the two coasts of the English Channel speaks volumes: one is almost romantic, the other is rather Spartan. We took a short train ride to the great port of Southampton. This was sort of the mid-point of our voyage.

Here we boarded the 21000-ton luxury liner Royal Rotterdam, a smaller version of the Titanic. It carried 1250 people, excluding the crew and had all the facilities which would make the journey a real delight: a magnificent central lobby with a grand staircase and deluxe shops, indoor and outdoor lounges, dining rooms, bars, movie theatres, a grand ballroom, several levels of cabins and decks and even a swimming pool. We had a small cabin for the four of us. Since we had overcome sea-sickness on the day we left Bombay, we truly made the most of our crossing the Atlantic. We spent a lot of time exploring the magical world of the ship and enjoyed the many entertainments, which were provided, thankfully all free of charge. While dining we, the inexperienced, would routinely order several main courses. I had a fancy for the name, 'herring'. Once I ordered it. When the dish came I sat there without making a move: it looked like raw fish to me. On this occasion it was taken back grudgingly but in later years I prized this dish, which in spite of its appearance, was not raw at all. Atlantic

Ocean, unlike the Mediterranean Sea, was quite rough. Waves were some 10 feet high. One day there was a storm and the ship got tossed so badly that many lounge chairs slid to one side and a few, with people sitting in them, literally overturned. Even though we went through the same geographical area that the Titanic did, our ship managed to stay clear of the towering ice-bergs. And even though I could sketch very well, there was no one threatening to jump off the stem of the ship! Yet in spite of the five-day and 3600 mile crossing we never felt bored. Apart from the on-board fun, we also had the new pleasure of watching the dolphins, the flying fish and the many sea-birds. But there were no mermaids and no sea-monsters.

After a two-day scenic ride through the St. Lawrence River we landed in Montreal, named after Mount Royal, where a senior cousin brother was doing his PhD at McGill University and where I would live, practice and teach later for a few years. We stayed with him and his friends and soaked up India, complete with familiar food and Bengali songs, after a lapse of three long weeks. In those days you would rarely meet another compatriot, outside of the university campuses, and simply walk by without exchanging kinship greetings. Montreal, incidentally, was and is perhaps one of the most beautiful and most advanced cities in North America. It is also thoroughly bi-cultural with a distinct French flavor. Several years later, I witnessed the winter festival in the nearby Quebec City, during which many full-size buildings of ice-blocks are put up on dry snowscape to the merriment of the shivering people.

Now, on with the last leg of the great voyage... We boarded a Greyhound Bus, with a sleek metallic body and a very comfortable interior with tinted glass, reclining seats and headrests, all of which were novelties to us, as was the on-board bathroom, a rare feature even on today's luxury buses in India. After a good night's sleep, we arrived in the mammoth and airport-like Port Authority Bus Terminal in New York City. Here we took a shower and had an American-size breakfast, consisting of two eggs, toasts , butter, jam and an unlimited supply of coffee, for only about 30 cents. On this occasion we could not visit this great city, the virtual capital of the world, but years later I had the privilege of working here for the Architect of the U.S.Embassy in New Delhi and living next to Hudson River. From New York we had to go our own ways, all alone in a very distant and strange land. So, with a combination of sadness and excitement in my heart, I boarded another Greyhound Bus and slept through the night comfortably. To my utter amazement, the Dean himself and his wife came to receive me at the bus station. He even carried my bags. They were truly warm and understanding and went all-out to make me feel at home, well literally in their own deluxe home, which he had designed, and in which I spent the first few days of my life in this great country. Being an Architect , I never can forget that I slept on the same bed and in the same room in which slept my hero , the world-renowned Architect, perhaps the greatest of the 20th century, Frank Lloyd Wright, whose spiraling Guggenheim Museum in New York City is known to one and all.

I came with only a nine-month appointment. Little did I know that my voyage had only begun!

# পনেরো সপ্তাহ পরে

*সুস্মিতা মহলানবীশ*

বেশ কিছুক্ষণ ধরে এঘর ওঘর ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন রঞ্জন সেন। কি করে কথাটা বলা যায় স্ত্রী সবিতাকে ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না। পরস্পর পরস্পরের কাছে কিছু গোপন করতে পারবেন না, বিয়ের আগেই এই প্রতিজ্ঞা করেছেন ওনারা। সাঁইত্রিশ বছরের ঘর সংসারের এই প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন হয়নি কখনো। জীবনে কত উত্থান পতন বার বার ঘটল, দুজনে একসঙ্গে সব সুখ দুঃখ কেমন করে ভাগ করে চলেছেন, এই স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে রঞ্জন সেন কখন যেন নিজের যৌবনে ফিরে এসেছেন। ওনার যৌবন আশা, আকাঙ্খা, সততা আর প্রাণোচ্ছলতায় ভর্তি ছিল। সেই যৌবন শুধু স্মৃতি হয়ে রইল, তাতে ওনার কোনো দুঃখ নেই, বরং সৎপথে থেকে নিজেকে সুপরিচালনা করে চলতে পারছেন বলে মনে মনে গর্বিত। সবিতার সহযোগিতা ছাড়া এটা সম্ভব হোতো না বলে উনি স্ত্রীর কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

মা বাবার সর্বকনিষ্ঠ ও একমাত্র পুত্র সন্তান রঞ্জন সেন কোলকাতার মোহনবাগানের বড় খেলোয়ার ছিলেন। দুই দিদি ও জামাইবাবুরাও তাঁকে নিয়ে গর্বিত ছিলেন। তাঁর দক্ষতা, ব্যক্তিত্বে সততা এবং ন্যায়পরায়ণতা সবার আনন্দের কারণ ছিল। জামাইবাবুরা ওনাদের কোম্পানীতে শ্যালকটিকে চাকুরীর প্রস্তাব দিলে রঞ্জন সেন হেসে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। বাবা সত্য সেন এই অনিচ্ছাকে সম্মান করে ছেলেকে বলেছিলেন, খেলে যেমন সুনাম কিনেছো, তেমনি সৎপথে থেকে সুনামটা বজায় রেখো। টাকা রোজগার করতে গিয়ে নিজেকে ছোটো কোরো না। আর কিছু থাক না থাক, পৈত্রিক সম্পত্তি হিসাবে কোলকাতার এই বাড়ীটা আমার ও তোমার মায়ের পর শুধু তুমিই পাবে।

দিদিদের বাবা প্রচুর পয়সা খরচ করে বিয়ে দিয়েছেন। যে বাড়ীটায় উনি ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তা বর্ত্তমানে পুরোটাই ওনার। বাবা সত্য সেন ছেলেকে একথাও বলেছিলেন, 'আমার মৃত্যুর পর তোমার মাকে আমাদের দেশের প্রথামত দেখাশোনা কোরো'। বাবার কথাগুলো আজও রঞ্জন সেনের কানে বাজে। দেশের প্রথামত অর্থাৎ বাবা বলতে চেয়েছিলেন, 'অন্য কোনো ধরনের বৃদ্ধশালায় বা আশ্রমে নয়, নিজের কাছে যত্নকরে রেখো'।

রঞ্জন সেন জানেন বাবার প্রতিটি কথা উনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে পেরেছেন শুধু সবিতার সহযোগিতায়। বাবা এ কথাও বলেছিলেন, 'জানি বৌমার তরফ থেকে সেবা যত্নেকোনো ত্রুটি হবে না'। স্ত্রীকে মনে মনে প্রশংসা করে বল্লেন, - 'জানি তোমারই জয় হোলো, মা বাবার প্রচন্ড বিশ্বাস তুমি রাখতে পেরেছো'।

আজ বারো বছর হয় বাবা মারা গেছেন। প্রিয়জনকে হারিয়ে মা যেন হঠাৎ কেমন বদলে গেলেন। একমাত্র নাতি রোহনের এবং সেন পরিবারের কোনোকিছুর উপরেই সবিতার নজর নেই বলে দোষারোপ করে তাকে চাকুরী ছাড়তে বাধ্য করালেন, কিন্তুবাবার মৃত্যুর আগে পর্যন্তসবিতার প্রতি মায়ের অগাধ ভালোবাসা ছিল, অনেক সময়ে মনে হোতো সবিতাকেই মা ওঁনার নিজের সন্তানদের থেকে বেশীভালোবাসেন। স্কুলে যাওয়ার আগে প্রচন্ড গরম ভাত সবিতার খেতে কষ্ট হোতো বলে মা নিজে চামচ দিয়ে নেড়ে ফ্যান চালিয়ে একটুঠান্ডা করে সবিতাকে খেতে ডাকতেন। সবিতা যা খেতে ভালোবাসে তা একটুবেশী করে ওর জন্য তুলে রাখতেন।

রোহন হওয়ায় পর মা যাবা নিজেরাই নাতির দেখাশোনায় দায়িত্ব নিজেদের হাতে তুলে নিলেন। মা বলতেন, আমরা থাকতে সবিতাকে ঘর সংসার করে ছেলে সামলে চাকুরীকরতে যেতে হবে না। রঞ্জন সেনের মনে পড়ে কতদিন ঠাট্টার ছলে তাদের বাড়ীতে শ্বাশুড়ীবৌয়ের তর্ক হোতো। রঞ্জন ও সবিতার টিফিন বাক্স মা নিজের হাতে সাজিয়ে দিতেন। সবিতা কতদিন বলেছে, মা তুমি এত কষ্ট কোরো না, আমিই সব ঠিক করে নেব। মা ধমক দিয়ে বলেছেন, 'কেন, আমি তো সবসময়েই বাড়ীতেই থাকি, তোর অসুবিধা কোথায়?' অতীতের কত টুকরো টুকরো মিষ্টি স্মৃতি মনে ও চোখে ভেসে আসায় রঞ্জন সেনের চোখদুটি সজল হয়ে উঠল। তিনি পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখের সাথে সাথে চশমার কাঁচ দুটিও পরিষ্কার করে নিলেন।

বর্ত্তমানে ওনার বয়স ৬২ এবং সবিতার ৫৮ হয়েছে। ৪ বছর আগে রঞ্জন সেন ব্যঙ্ক থেকে অবসর গ্রহণ করলেও অন্য একটা ছোট কোম্পানীতে কম পয়সায় চাকুরী করে যাচ্ছেন। এক বছর হয় মাও পৃথিবীথেকে বিদায় নিয়েছেন। যাওয়ার আগে মা বহুরকম রোগের শিকার হয়েছিলেন। তাতে প্রচন্ড রকম টাকা পয়সাও ব্যয় করতে হয়েছে। স বিতাকে আবার বাড়ীতেই টিউশানি শুরু করতে হয়েছে কিন্তু তার জন্য শাশুড়ীর সেবা শুশ্রুষার কোনো ত্রুটি সে করে নি। মৃত্যুর আগে মা বার বার সবিতার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে গেছেন। দিদিরা মাকে নিয়ে কিছুদিন তাদের বাড়ীতে রাখতে চাইলে মা নিজের বাড়ী ছেড়ে এবং সবিতার নিঃস্বার্থ সেবা ছেড়ে যাবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন।

সময় কারো জন্য আপেক্ষা করে থাকে না, সে নিজ গতিতে বয়ে চলে। রোহনও আর ছোটোটি নেই, সে ব্যাঙ্গালোর থেকে কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পাশ করে গত ছ'মাস আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি দিয়েছে। বাড়ীটা বড় ফাঁকা, বহুদিন ধরে বিভিন্ন সমস্যার মধ্য দিয়ে চলায় রঞ্জন সেন ও সবিতার ক্লান্ত শরীর ও মন বাইরে গিয়ে একটু হাওয়া বদল করে আসার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে। সবিতার ইচ্ছে কিছুদিনের জন্য পুরী ঘুরে আসার। মায়ের অসুখ, ছেলের পড়াশোনা, তাতেই সঞ্চয়ের সবকিছু চলে গেছে।

আজ রঞ্জন সেন মনে মনে একটা পথ খুঁজে বের করেছেন। কিন্তু কি করে প্রস্তাবটা স্ত্রীর কিছে উপস্থাপন করবেন ভেবে নিয়ে একটু হেসে সবিতার কাছে বসে বল্লেন, 'আমরা এই পনেরো দিনের মধ্যেই পুরী যাবো বলে ভাবছি'। সবিতা হেসে বল্লেন, ' পনেরো দিনের মধ্যে? সে তো খুব ভালো কথা, কিন্তু অত টাকা কোথায়? টিকিট কাটা, হোটেল বুক করা, খাওয়া-দাওয়া আরো কতো কি। রঞ্জন সেন মিটি মিটি হেসে বল্লেন, 'তার ব্যবস্থা ঠিক হয়ে যাবে। তারপর একটু হেসে বল্লেন, 'দেখো, রোহন পড়াশোনায় খুব ভালো কিন্তু সে আমার মতো কোনোদিন খেলাধূলা পছন্দ করে নি, তা ছাড়া ফুটবল খেলায় ওর কোনো উৎসাহ কখনোই ছিল না বা বর্ত্তমানেও নেই, তাই ভাবছি আমার খেলায় অর্জন করা জিনিসপত্র বিক্রি করে দিয়ে তুমি আর আমি সমুদ্র পাড়ে পাড়ি দেবো। রঞ্জন সেন আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, সবিতা হাত তুলে ওনার অসমাপ্ত কথা থামিয়ে বল্লেন - 'কেন রোহনই কি তোমার একমাত্র ব্যক্তি, সে খেলাধূলা পছন্দ করে নি বলে সব বিক্রি করে দেবে? আমার ভালো লাগারও তো মূল্য আছে। তা ছাড়া আমাদের নাতি নাতনী - তারাও তো ভবিষ্যতে এসব দেখতে চাইতে পারে। সমুদ্র দর্শনের বিনিময়ে এইসব জিনিষের একটাও বাড়ীথেকে নড়চড় করা চলবে না'।

একটু থেমে শান্তগলায় আস্তে আস্তে স্বামীর গায়ে হাত দিয়ে বললেন - 'পনের দিন কেন, আরো না হয় পনেরো

সপ্তাহ পরে আমরা পুরী যাব'। রঞ্জন সেন সবিতার হাতটা নিজের হাতে টেনে বল্লেন - 'তা হলে পনেরো সপ্তাহ পরেও ঐ একই অবস্থা থাকবে। আর যাওয়া হবে না, কারণ আমার পক্ষে শিগ্গিরই কোনো টাকা পাওয়া সম্ভব নয়। সবিতা হেসে বল্লেন - 'কিন্তু আমার পক্ষে সম্ভব'। রঞ্জন সেনের বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। তিনি সবিতার দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে বল্লেন - 'না, তোমার গয়নাগাটি বিক্রি করা চলবে না'। রঞ্জন সেনের কথায় সবিতার মুখে হাসি ফুটে উঠল। তিনি স্বামীর দিকে তাকিয়ে বল্লেন - 'না, ও কাজ আমি করতে যাব না। আমাকে শুধু আরো দুটো টিউশানি করতে সময় দাও, তাতেই আমাদের যাতায়তের টাকা হয়ে যাবে। তা ছাড়া আমার তো এখন আর সে রকম দ্বায়িত্ব নেই, তারপর পাশের পাড়ায় দুটো মেয়ে চাইছে আমি তাদের ইংরাজীটা পড়াই, কারণ ওতে ওরা ব্যাক পেয়েছে। রঞ্জন সেনের মুখটা একটুকালো হয়ে গেল, আস্তেকরে তিনি বল্লেন - 'তুমি কষ্ট করে পড়াবে আর আমরা তাই দিয়ে মজা করতে যাব'? সবিতা বল্লেন - 'তুমি এত দিনেও আমায় চিনলে না? তোমার আর আমার আলাদা বলে কিছু আছে কি'? রঞ্জন সেনের মনে হলো সবিতার চোখ দুটি একটু চিক চিক করে উঠছে এবং মুখে বিষাদের ছায়া নেমে আসছে। তিনি সবিতাকে টেনে বুকে জড়িয়ে ধরিয়ে বল্লেন - 'আমি জানি, আমি খুব ভাগ্যবান, আমি সে রকম কিছু ভেবে বলিনি। একটু থেমে বল্লেন - তবে ঠিক আছে, পনেরো সপ্তাহ পরেই চিন্তা করা যাবে'। এবার সবিতার মুখেও হাসি ফুটে উঠল এবং তিনি স্বামীর কথার পুনরাবৃত্তি করে বল্লেন - 'ঠিক আছে, পনেরো সপ্তাহ পরেই চিন্তা করা যাবে'।

# Hindu Religion

*Jharna Chatterjee*

*[I am writing this article especially for the young people of Indian origin, based on my assumption that most of them probably did not have an opportunity to think about or to find out some of the ideas I would like to present here.]*

It is commonly believed that Hindu religion involves 'idol-worship'. Well, in truth, Hinduism is not a religion in the same sense as Christianity is. It is a way of life for a vast number of people living in a specific geographical region. Hindus are diverse - including agnostics, those who believe in God, those who do not, those who believe in worshipping a certain form of Divine entity such as Kali, Vishnu or Shiva and those who believe in life after death and reincarnation, and those who do not. Some Hindus are strict vegetarians, some eat fish, milk products and eggs but no meat, and some of them eat meat but not beef or pork and so on. Some would never go to any temples (except for sight-seeing) nor participate in any worship, while some meditate on One Infinite, Indescribable, and Supreme Reality. Then there are others who believe in millions of deities. But all of the above - believers and non-believers alike can call themselves Hindus! In that sense, tolerance for difference and diversity is built into Hinduism. Amartya Sen, the renowned Nobel Laureate, has described the 'argumentative tradition' of India in great detail (see "The Argumentative Indian"), and mentioned the Hindu sages Javali and Charvaka who expounded the virtue of materialism and recommended not relying on anything non-empirical (for example, after-world and its rewards or punishments according to one's actions).

Secondly, Hindu religious rites are characterized by a significant use of symbolism - just like other religions. Think about the Cross or the Madonna - do Christians hold them in respect because they are simply a cross or an idol, or because they symbolize something noble like self-sacrifice for others? Hindus do not worship 'idols'; they worship the ideals these images represent - like United Power (Durga), Gracious Prosperity (Lakshmi), Perseverance and Love of Learning (Ganesha), and Benevolent Destruction (Shiva) for the cosmic cycle to continue. Even the animals that accompany these deities represent aspired qualities; for example, the lion carrying Durga on his back represents courage. A wise scholar once compared the Hindu images to "runways from which man's heavily sense-embodied spirit can take off" on its path to the Infinite. They are the tools that help us to concentrate. The symbols or the multitude of rituals associated with a Hindu puja are only instrumental to the spiritual ends they seek.

Have you ever heard this anecdote about Swami Vivekananda? Once an aristocratic man from a different religious faith ridiculed him for worshipping idols. Swamiji did not respond immediately. There was a photo of this respected man on the wall, which he requested to be brought down. Swamiji held it in his hands and then asked the assembled attendants to spit on the photograph. When they expressed outrage, he politely asked, "Why? What is the problem? This is only a piece of paper – and not the real person!" The message was clear.

I do not wish to proclaim that every person who worships a deity always thinks about these ideals. There may be many who do not *think* and put more emphasis on the rituals, but there are also those who *think* and try to understand their true meaning. Sri Ramakrishna, Sri Aurobindo and Swami Vivekananda were such thinkers as well as saints. Rabindranath was not an orthodox Hindu, but this great poet of India wrote numerous devotional poems and songs that resonated with the wisdom found in the Hindu sacred book, the Upanishad.

Whether one observes rituals or thinks, I believe that the value of religion is to help one improve the quality of one's spiritual life. Religion and faith may help some people through difficult times, or help them become more caring or more forgiving. The beauty of Hinduism is that the specific path chosen is not as important as the end goal. Understanding the goal is a very individual experience just as choosing the path is - as we face the great challenge called life.

# অভিনয়

*শ্যামলী দাশ*

*চৈত্র মাসের ঝরা পাতা, যাবার বেলেয় বারে বারে,*
*ডাক দিয়ে যায় পাতার দ্বারে দ্বারে ।*
*ফাগুন আসে ফিরে ফিরে দক্ষিণ বায়ে,*
*নিত্য নতুন ফুল ফোটে এই জীবনের বনচ্ছায়ে ।।*

প্রকৃতির অভিনয় পৃথিবীর মঞ্চে অথবা রঙ্গশালায়। কখনো রাজা কখনো রানী সেজে। কখনো রুদ্র সন্ন্যাসী, আবার কখনো প্রেমসিক্ত একাকিনী প্রমিকা, মেঘমল্লার শব্দে বিরহ যাতনায় আকুলিতা। কখনো আবার নর্ত্তকী ফুলসাজে সজ্জিতা হয়ে আহ্বান জানায় মর্ত্তের জীবদের - মনের ছন্দ ছড়িয়ে ছাপিয়ে দিতে চায় নিজ আনন্দ সবার মাঝে। অভিনয়ের নির্দিষ্ট সময় আছে একের পর এক ছকে বাধা। আসে আর যায় মর্ত্তের রঙ্গমঞ্চে, কোন পরিবর্ত্তন নেই। আশ্চর্য, দর্শকরা কেউ বিরক্ত হয় না। অভিনেতা অবিনেত্রীর অপূর্ব অভিনয়ে সবাই আমরা বিভোর হয়ে আছি, কান্না হাসির দোলায় সবাই মশগুল। নায়ক-নায়ীকার অভিনয়ের সময় নির্দিষ্ট - না আগে না পরে। কখনো কেউ আগে আসে না, বা অযথা কথা বলে লোক হাসায় না। এখানে নায়ক নয়ীকা অভিনয়ের লাইনও ভুলে যায় না। কত কবি, কত সাহিত্যিক, কত গায়ক মিনতি জানিয়েছে একটু সময় নিয়ে অভিনয় করতে, কিন্তু নায়ক-নায়ীকা নিজেস্ব প্রতিভায় এতই মশগুল যে, কারুর অনুরোধ, উপরোধ, আদর মনে দাগ কাটে না। এরা একে অপরকে ডেকে মঞ্চের চাকার মধ্যে ঘুরে ঘুরে মর্ত্তের মানুষদের মাঝে হাসি-কান্নার পালায় চামর বুলিয়ে দিয়ে যায়।

নদীর স্রোতকে ধরে রাখা যায় পাথরের বাঁধনে, কিন্তু কখনো কেউ আটকাতে পেরেছে কি প্রকৃতির এই আসা-যাওয়ার পালা? দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ - অবিরাম অনন্তকাল অভিনয়ের মঞ্চে এই নাটক হয়ে চলেছে। আমরা, দর্শকরা বিনা মূল্যে, বিনা নিমন্ত্রণে দেখে চলেছি প্রকৃতির এই অভিনব অভিনয়।

চলতে চলতে জীবনের মাঝ পথে এসে পিছনে ফিরে তাকিয়ে দেখি মনের পাতার জানলায় ঠিক একই ভাবে উছলে ওঠে শিশু-বয়সের উজ্জ্বল সেই সুর - 'মোর বীণা উঠে কোন সুরে বাজি.....'

নায়ক নায়ীকার কথা বলতে গিয়ে উপলব্ধি করলাম - আমিও তো ঠিক একই ভাবে বছরের পর বছর একই অভিনয় করে চলেছি - তাই তো বছরের একই সময় আমারও মনে গুনগুনিয়ে ওঠে - 'ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে....'।

কত কবিতা, কত গান রচিত হয়েছে, এই নায়ক নায়ীকার অভিনয়ের জন্য... 'আলোকের নৃতে বনান্ত, মুখরিত অধীর আনন্দে...'। তাই আমারও আজ ডাক দিয়ে বলতে ইচ্ছে করছে -

*'ওরে গৃহবাসি, খোল দ্বার খোল,*
*লাগলো যে দোল,*
*স্থলে জলে বনতলে*
*লাগলো যে দোল,*
*দ্বার খোল দ্বার খোল..... '*

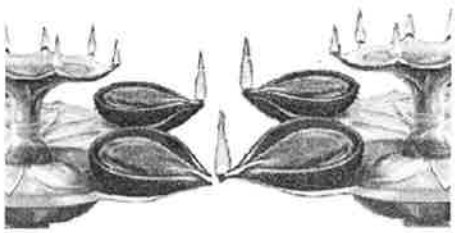

# অদ্ভৌতিক

*প্রসেনজিৎ দত্ত*

উত্তরাঞ্চলের কেদারনাথ ও বদ্রিনাথ মন্দির সকল হিন্দুর কাছে সর্বোত্তম তীর্থস্থান। ধর্মে আছে, শারীরিকভাবে সবল থাকলে জীবনে অন্ততঃ একবার এই তীর্থভ্রমণ করা বাঞ্ছনীয়। পথ দুর্গম হওয়া সত্ত্বেও বছরের যে ছ'মাস মন্দির খোলা থাকে, প্রায় সব সময়েই তীর্থযাত্রীদের ভীড় লেগে থাকে।

ছোট্ট সংসার সুবোধবাবু ও স্ত্রী বিজয়ার। দুজনেরই বয়স ষাটের ওপর এবং দুজনেই অবসরপ্রাপ্ত। সুবোধবাবু সিভিল ইঞ্জিনীয়ার, একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের অত্যাধুনিক কারখানার জল ও জলের পাইপলাইনের রক্ষণাবেক্ষণের মূল দায়িত্বে ছিলেন তিনি। বিজয়াদেবী ছিলেন স্কুলের শিক্ষীকা, এবং সেই হিসাবে বেশ নাম ছিল তাঁর। একমাত্র মেয়ে কাকলির অনেককাল আগেই বিয়ে হয়ে গেছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেক্ট্রিকাল ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের স্বর্ণপদক প্রাপ্তা কাকলি বিয়েও করেছিল নিজেরই ক্লাসের অনিমেষকে। ছেলে সুমন ছোট, স্কুলে পড়ে। সুবোধবাবু কাজের মধ্যে ডুবে থাকতেই ভালোবাসতেন, তাই অবসরগ্রহণের পর কেমন যেন মনমরা ও বেসামাল হয়ে পড়েছিলেন। অকারণে কথায় কথায় স্ত্রীর ওপর চেঁচামেচি করতেন, অন্য সময়ে খবরের কাগজ পড়তেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অথবা নিজের ইঞ্জিনীয়ারিং বই ও ম্যাগাজিন নিয়ে নাড়াচাড়া করতেন। অবশ্য অন্যান্য বিষয়ে পড়াশোনা করতেও ভালোবাসতেন। এসব সত্ত্বেও বিজয়াদেবী কিন্তু সবসময় খুশী থাকারই চেষ্টা করতেন, নানাভাবে সুবোধবাবুর মন ভুলিয়ে রাখার কাজে ব্রতী হয়ে থাকতেন।

অনেকদিন ধরেই কাকলির ইচ্ছা বাবা-মা, অনিমেষ আর সুমনকে নিয়ে কোথাও ঘুরে আসে, কিন্তু সময় আর করে উঠতে পারে না কিছুতেই। দুজনের চাকরি, সুমনের স্কুল সব কিছু মিলিয়ে সময় বার করাই মুশকিল। বাবা-মাকে কোথাও একা পাঠিয়ে দিতেও ভয় লাগে, তাই সবসময় একটা মানসিক অস্বস্তির মধ্যে থাকে সে। এমনই একদিন বাইরের ঘরে বসে বাংলা খবর কাগজের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে হঠাৎ চোখে পড়ল, কলকাতার এক নামকরা ভ্রমণ সংস্থা বিজ্ঞাপন দিয়েছে, তারা তীর্থভ্রমন করানোর জন্য একটি বিশেষ ট্যুরের আয়োজন করেছে। ওদের গাইড থাকবে সাথে এবং যাত্রীদের সমস্ত দায়ীত্ব ওরা নেবে। হঠাৎ খুশীতে ডগমগ করে উঠল মনটা। মনে হলো বুকের ওপর থেকে একটা ভার যেন হাল্কা হয়ে গেল। তক্ষুণি মাকে ফোন করতে ছুটল।

রান্নাঘরে ছিলেন বিজয়াদেবী। হঠাৎ ফোনের ঘন্টি শুনে একটু অবাকই হলেন। এই সময় আবার কে ফোন করল? বুঝি একটু বিরক্তও হলেন - তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে বাইরের ঘরের দিকে গেলেন ফোনটা তুলতে। অপর দিক থেকে মেয়ের উত্তেজিত গলা শুনে কি খুশী যে হলেন তা বলে বোঝানো মুশকিল। বলতে শুরু করলেন, 'কেমন আছিস তোরা? দাদুভাই কই? .....' কিন্তু কাকলির আর যেন তর সয় না। বলল, 'মা, তোমার আর বাপীর জন্য একটা দারুণ খবর আছে।' সব শুনে বিজয়াদেবী কেমন যেন একটু থতমত খেয়ে গেলেন। 'তীর্থভ্রমণ? তুই কি খেপেছিস? আমাদের কি আর সে শরীরের অবস্থা আছে রে? তা ছাড়া তোর বাবাকে ওর বইপত্রের থেকে নাড়াতে পারবো ভাবছিস? তীর্থ-টীর্থ ওর দ্বারা হবে না।' কিন্তু কাকলি কোন কিছু শুনতেই রাজী না। 'খুব হবে। এই একটা সংস্থা যাদের ওপর আমার সম্পূর্ণ আস্থা আছে, দেখবে তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না, আমি এক্ষুণি আসছি বাপীকে রাজী করাতে।'

কুন্ডু ট্র্যাভেলসের সুপটু তত্ত্বাবধানে পঞ্চাশজনের যাত্রীদলের সাথে সুবোধবাবু ও বিজয়াদেবী শতাব্দী এক্সপ্রেসে করে এসে পৌঁছালেন হরিদ্বারে। ভয় ছিল, ট্রেনে ঘুম হবে না, কিন্তু যাওয়ার উত্তেজনা ও গোছগাছ করা আর যাত্রা করার পরিশ্রমের ফলেই বোধহয় দুজনেই কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছেন, বুঝতেও পারেননি। ভ্রমণ সংস্থার ব্যবস্থাপনায় বেশ ভালোই একটা হোটেলে এসে উঠলেন সকলে। মুখ হাত ধুয়ে স্নান সেরে সকলে ঘুরতে বেরোলেন হরিদ্বার শহরে। পরের দিন ভোরবেলা আবার রওনা হওয়া, তাই সবাই ঠিক করলেন, দুপুরবেলা 'দাদা-দিদির হোটেলে' খেয়ে হরিদ্বারের অধীষ্ঠিতা দেবী মায়া দেবীর মন্দিরে পূজো দেবেন। পূজো সেরে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে কেউ ডুব দিলেন, কেউ বা একটু পা ভিজিয়ে নিলেন, আবার কেউ কেউ জলে নামলেনই না, দূর থেকে দাঁড়িয়ে অন্যদের জলে নামা দেখলেন। পরের দিন দুটো ছোট ছোট বাসে ভাগাভাগি করে সবাই উঠলেন। পথে রাজাজী জাতীয় উদ্যানের বনাঞ্চলের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে তার অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখে সকলে মুগ্ধ হলেন। দেখতে দেখতে ওঁরা এসে পৌঁছলেন লছমনঝুলায়। নেমে একটু হাত-পা ছড়িয়ে নিয়ে গঙ্গার ওপরে সাঁকোয় গিয়ে দাঁড়িয়ে বিজয়া দেবী অবাক হয়ে দেখলেন, জলটা এতো পরিষ্কার যে নীচের নুড়ি পাথরগুলোকে পর্য্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কলকাতা পর্য্যন্ত পৌঁছাতে পৌঁছাতে এই নদীটার কি হালটাই না হয়! মজা লাগল দেখতে, পূণ্যার্থীদের ছড়ানো মুড়ি খাওয়ার জন্য মাছেদের ভীড় - এত উঁচু থেকেও দেখতে এতটুকু কষ্ট হলো না। লছমনঝুলায় বিশ্রাম নেওয়ার পর বাস আবার রওনা দিল। এরপর ঋষীকেশ হয়ে খরস্রোতা গঙ্গার ধার দিয়ে যেতে যেতে শিবপুরী পৌঁছে বাস আবার রওনা দিল দেবপ্রয়াগের দিকে। এই দেবপ্রয়াগে গঙ্গা তিনটি নদির সংমিশ্রনের থেকে জন্ম নেয় - মন্দাকিনী (কেদারনাথের পথে), অলকানন্দা (বদ্রীনাথগামী) ও ভাগীরথী (গোমুখ)। মনে হয়, প্রকৃতি যেন তার ডালী উজার করে দিয়েছে এখানে! এখান থেকে গুপ্তকাশী হয়ে শোনপ্রয়াগ। এরপর এই রাস্তায় বাসের শেষ গন্তব্যস্থান গৌরীকুন্ড। এখানেই একটা আশ্রমে সবার থাকার ব্যবস্থা হলো। রাত কাটিয়ে পরের দিন ভোরবেলা কনকনে শীতের মধ্যে ওঁরা রওনা দিলেন কেদারের দিকে। এখান থেকে কেদার পৌঁছতে হলে হয় পায়ে হেঁটে অথবা টাট্টু ঘোড়ায় চেপে কিংবা ডান্ডিতে (পাল্কী) করে যেতে হয়। সুবোধবাবু ও বিজয়াদেবী ঠিক করলেন, টাট্টু ঘোড়ায় চেপেই যাবেন। আসলে যাত্রীদের মধ্যে দামোদর মুখোপাধ্যায় নামে এক ভদ্রলোকের সাথে দুজনেরই বেশ ভালো আলাপ হয়ে গিয়েছিলো। মোটামুটি তাঁরই সাথে সঙ্গ দিতে ওঁরা এই সিদ্ধান্ত নিলেন। কেদার পৌঁছাতে বেশ কয়েক ঘন্টা সময় লাগলো। খুব পরিশ্রান্ত লাগছিল, কিন্তু মন্দিরের চূড়া দেখতে পাওয়ার সাথে সাথে ওঁদের সমস্ত গ্লানি ও কষ্ট যেন নিমেষের মধ্যে দূর হয়ে গেল। কী অপূর্ব দৃশ্য! চারদিকে বরফে ঢাকা পাহাড়ের প্রেক্ষাপটে যেন সকলকে ছাপিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরটা। মন্দির পর্য্যন্ত পৌঁছাতে ঘোড়া থেকে নেমে মন্দাকিনীর ওপর দিয়ে একটা সাঁকো পায়ে হেঁটে পেরোতে হয়। পূজো দিয়ে ফিরতে ফিরতে প্রায় বিকেল হয়ে গেল।

মন্দির থেকে বেড়িয়েই হঠাৎ বিজয়াদেবীর ভীষণ শরীর খারাপ লাগতে লাগলো। পা যেন আর টানছে না। ইচ্ছা করলো যেন মাটিতেই বসে পড়েন। কিন্তু কাউকে কিছু বললেন না। কোনরকম ভাবে সাঁকোটার কাছে গিয়ে পৌঁছলেন, তারপর আর চলতে না পেরে ওখানেই বসে পড়লেন। সুবোধবাবু আর দামোদরবাবু গল্প করতে করতে একটু পিছিয়ে পড়েছিলেন, বিজয়াদেবীর অবস্থা দেখে দৌড়ে আসলেন ওঁকে সাহায্য করার জন্য। কোনরকমে ওঁকে টাট্টু ঘোড়ায় চাপিয়ে ধীরে ধীরে আশ্রমে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। বিছানায় শুতে না শুতেই ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন বিজয়াদেবী। সকলে বলাবলি করতে লাগলেন, 'বড্ড ধকল গেছে'।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছেন মনে নেই, হঠাৎ মনে হলো যেন একটা অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে চলেছেন। অনেকদূরে একটা ক্ষীণ আলোর রশ্মী দেখা যাচ্ছে, উনি যেন স্বপ্নাচ্ছনের মতো ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে চলেছেন। অনেকটা চলার পরে এবার আলোটা যেন আরো প্রকট হয়ে উঠেছে, মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেই সূত্রের দিকে তিনি চলেছেন। অথচ, ওনার আর কোন ক্লান্তি লাগছে না, এত লম্বা পথ হওয়া সত্ত্বেও কিসের টানে যে এগিয়ে চলেছেন, জানেন না। হঠাৎ রাস্তার দুধার থেকে সোনালী রঙের দুটো সাপ বেড়িয়ে এসে ওঁর রাস্তা আগলে ধরলো।

বিজয়াদেবীর ঘুমটা কেন জানি আচমকা ভেঙে গেল। ঘড়িতে চোখ পড়তে দেখলেন রাত দুটো বাজে। সারা শরীর মনে হতে লাগলো যেন দরদর করে ঘামছে। বাইরের প্রচন্ড শীতের প্রকোপ থেকে বাঁচবার জন্য যে মোটা লেপ-কম্বল চাপিয়ে শুয়েছিলেন, এক টানে সেগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তা সত্ত্বেও যেন গরম এতটুকু কমলো না। আর থাকতে না পেরে গায়ের জামাকাপড়গুলোও খুলতে শুরু করলেন। কিন্তু কোন কিছুতেই গরম যেন আর কমে না! দৌড়ে ঢুকলেন বাথরুমে, শাওয়ার খুলে দিলেন। শাওয়ারের বরফগলা জল গায়ে লাগতে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি। কতক্ষণ ছিলেন জানা নেই, তারপর কখন যে শরীরটাকে টানতে টানতে বিছানায় এসে পড়লেন তাও কেউ জানে না। অবশেষে আবার ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন।

পরের দিন সকালে যখন ঘুম ভাঙলো, দেখলেন পাশের ঘরে প্রচুর লোকের ভীড়। তার মধ্যে কে যেন গুমরে গুমরে কাঁদছে। দৌড়ে উঠে গিয়ে যে দৃশ্য দেখলেন, শরীরের রক্ত হীম হয়ে গেল তাঁর। একটা বিছানার ওপর দামোদরবাবুর প্রাণহীন দেহটা শয্যায়িত, তাঁর পায়ের কাছে তাঁর ভাগ্নী বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কোনভাবে বিজয়াদেবীর মুখ থেকে বেরলো, 'এ কী! এ কি করে হলো?' কাঁদতে কাঁদতে ভাগ্নী বলল, 'জানি না, সকাল বেলা অনেক ডাকাডাকির পর যখন উঠলেন না, ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডেকে আনলাম। উনি দেখে বললেন, 'মামা কাল রাত দুটোর সময়েই মারা গেছেন।' বিজয়াদেবী তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। হঠাৎ মনে হলো, তবে কি যমদূত এসেছিল কাল রাতে দামোদরবাবুকে নিয়ে যেতে? যাওয়ার পথে কি তাহলে বিজয়াদেবীর ঘর হয়ে গিয়েছিলো সে? কথাটা ভাবতেই যেন সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। ঠিক করলেন, রাতে যে ঘটনাটা তাঁর সাথে ঘটেছিল, কাউকে জানাবেন না। আর বললেই বা কে বিশ্বাস করবে?

এরপর দুবছর কেটে গেছে। দুজনেই নিজের নিজের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে গিয়ে দামোদরবাবুর ব্যাপারটি প্রায় ভুলেই গেছেন। বিজয়াদেবীও নিজের অভিজ্ঞতা সকলের থেকে এখনও গোপনই রেখেছেন। রোজ বিকেলবেলা সুবোধবাবু লেকের দিকে বেড়াতে যান, আজকেও তার অন্যথা হয়নি। হঠাৎ ফেরার পথে পুরণো বন্ধু পার্থর সাথে দেখা। পার্থ প্রায় জোর জবরদস্তি বন্ধুকে নিয়ে গেলেন নিজের বাড়ীতে। সেখানে পার্থ ও তাঁর স্ত্রীর সাথে বসে খানিক্ষণ জমিয়ে আড্ডা দিয়ে চা-জলখাবার খেয়ে উঠতে যাবেন, হঠাৎ একটা বই -এর দিকে সুবোধবাবুর নজর পড়ল - ডঃ রেমন্ড মুডীর লেখা 'লাইফ আফটার লাইফ'। খানিকটা কৌতুহল, খানিকটা আমোদের ছলেই বইটা তুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। বন্ধুকে বললেন, 'তুই আবার কবে থেকে এসব নিয়ে চর্চা করতে শুরু করলি?' পার্থবাবু বললেন, 'একবার পড়েই দেখনা - আমিও আগে এর কিছুই বিশ্বাস করিনি। ইট মে চেইঞ্জ ইওর লাইফ।' সুবোধবাবু বইটা নিলেন ঠিকই, তবে বন্ধুর কথার ওপর বিশ্বাস করে নয় - নিছকই ওনার মন রাখার জন্য। বইটা পড়ার কোন ইচ্ছাই ছিল না তাঁর। বাড়ী এসে যেমন কে তেমন ফেলে রেখে দিলেন বইটা।

এর কয়েকদিন পরে একদিন বিজয়াদেবী কিছু একটা পড়ার জন্য কোন একটা বই খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ সুবোধবাবুর ঘরে ঢুকে পার্থবাবুর বইটা দেখতে পেলেন। কয়েকটা পাতা উলটে পালটে দেখতে গিয়ে হঠাৎ একজনের এক সত্য অভিজ্ঞতার কথা পড়তে গিয়ে সারা গায়ের লোম যেন খাড়া হয়ে উঠল তাঁর। একি! এত যেন তাঁরই সেই স্বপ্নাচ্ছন্ন দৃশ্যের হুবহু বর্ণনা! অবিশ্বাস্য ব্যাপার! বই -এর সমস্ত ঘটনাই যে সব মানুষকে নিয়ে, তাঁরা সকলেই মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে ফিরে এসেছেন। বিজয়াদেবীর মনে আর কোন দ্বিধা রইল না, ভগবানের অসীম করুণায় তিনি অক্ষত অবস্থায় সেই তীর্থযাত্রা থেকে সেদিন প্রাণ নিয়ে ফিরতে পেরেছেন। একটা নামহীন আতঙ্ক যেন হঠাৎ তাঁকে গ্রাস করল। তাড়াতাড়ি বইটা বন্ধ করে এক ছুটে ঘর থেকে বেড়িয়ে গেলেন।

# New Years and a New Beginning

*Atasi Das*

*Vol. 1, Episode 11, in a journal series; Chennai (Madras), India*
*23.12.05- 05.01.06*

I packed up my bag filled with memories of sticky rice paddies and fisherman pants. I took one final glance around the room I labeled my home for the past six weeks, hugged my friend's dogs one last time, and caught a cab to the airport.

I was a young Bengali-American woman traveling around Asia solo.

Thailand and Southeast Asia proved to be fascinating, friendly, cheap, and loads of fun. My next stop was India and the timing coincided with local New Year's festivities. Being a seasoned independent traveler of six whole weeks, I boarded the plane with excitement and anticipation of a new environment, new smells, and new foods. This feeling was much different from the beginning of my Asia trip filled with bouts of anxiety a feverish need to research everything. I could relax, just a little more than before.

As I arrived in Chennai, India, I found myself in a whole other world. The reality of this smacked me straight in the face the instant I became the last person in a line to exchange money. There was only one man working at the bank with piles of bank books surrounding his desk. He did not seem so interested in efficiency. He looked indifferent to his surroundings and took what little control he had by setting the pace in which he worked. I grew restless and anxious. A reason for my lack patience was that I was on my first trip to India on my own. I made arrangements with meditation center, or ashram, months prior to me arriving in India. The world headquarters were based in Chennai. I was planning to stay there for two weeks and attempted to ensure that my arrival went smoothly. I even had another friend, Rita, who arrived at the same center to take a course week earlier, working on my smooth transition in. I carried printouts of emails with official permissions for accommodation and transportation as if they were the golden ticket. I was ensured an ashram driver would come pick me up and I did not want them to leave.

After two excruciating hours in the exchange line, I triumphantly held rupees in my hand but saw no ashram driver in sight. My mind quickly switched to savvy independent traveler mode. I paid no attention to the twenty rickshaw wallas and auto drivers bargaining for my business. I walked with confidence to a STD and made phone calls to various numbers I had to the ashram. No one picked up. I waited around, scanning visitors for a sign of my driver. I eventually resigned to the fact that I would get my first lesson in bargaining with auto drivers who spoke Tamil, a little English, and absolutely no Bengali. I negotiated what I later found out to be a high price but my focus on arriving to my destination kept me from being too picky? Spend thrifty.

As I loaded my things into the auto, I thought about how I loved the idea of experiencing an ashram especially during New Year's

celebrations. My friends glowed when they shared their wonderful experiences and encouraged me to make this journey. The idea of staying at an ashram also lured me with its claims of a peaceful environment, a welcoming community, and meditation sessions, otherwise known as satsangh in this particular system. I saw it as a temporary refuge from the world and my twenty-four years of experience in it. I thought of no better way to start the year.

As I finally approached the gates to my refuge, they were decidedly shut. There was a sign written, "Ashram closed due to recent flooding, all abhiyasi's are requested to find alternative arrangements." Alternative arrangements! I kept my cool and requested the security to find someone I could speak with to help me out. They were cautious but helpful. I waited outside the gates with my bags as Tata trucks and autos drove by stirring up the dust in the air. This was something I could wait patiently for. A few hours later, I was put in touch with a manager who found me an apartment to stay in and provided me access to the ashram for daily meals. My mind sighed with relief at the sight of a bed.

The manager was a busy man, organizing clean up crews, planning construction projects and coordinating the administration for this center. He told me that everyone had moved to another ashram in Tirripur, an eight hour train journey away, and that I should figure out a way to get there myself. I had millions of questions and he had very little time and patience to entertain them. How would I get there? Is anyone else going from here soon? Where is the closest STD and internet café? Would it be safe for me to go alone?

My parents were especially concerned when I shared my situation with them on the phone. They were terrified that their little girl would be traveling all alone to a small town in their rambunctious and volatile India. My adventurous confidence deflated a bit after speaking with them. I was determined to go but it seemed that the odds were against me. I called agency after agency and was met with discouraging voices. All the trains were pre-booked for the holiday season and a bus was not an option I was willing to take. It took me a few days of stumbling through several plans but I managed to get a flight to the closest airport in Coimbatore. I was assured that any taxi driver would know how to get to the ashram however the last couple of days made me second guess that assumption. Much to my surprise, as soon as I bought those tickets, everything automatically fell into place.

The ashram was nestled off the dusty main road within a green oasis of palm trees and walking gardens. There were dozens of tents set up around this area as the New Year celebrations was sure to bring several thousand fellow abhiyasi's, or meditators in the system, from around the world. I checked in, met the author of all of my electronic correspondences, and was briefed on a schedule that was open but not mandatory. I also met my friend, Rita, who was also patiently waiting for my arrival. We hugged and talked with fervor about our initial days and impressions of India. She was taking an intensive course on the system and filled me in with what would be ahead. I immediately felt a sense of security and home as I made my way to my assigned bunk in the overseas abhiyasi tent. The ashram manager who corresponded with me felt bad that no one arrived at the airport to pick me up and offered me a free bunk. I gratefully accepted.

As I walked into the tent, I was immediately accosted by a local man volunteering to work security. He apparently took his job very seriously.

<Aggressively concerned> "Did you pay for your bunk yet?"

<Disorientedly> "Not yet. The ashram manager said that..."

<Adamantly> "You have to pay! I am in charge of this tent and if you don't pay **whom** do you think is responsible. Madam, you must make sure you pay me okay!"

<Sheepishly> "Um..you see the ashram manager...told me that I don't have to pay because he would give me his bed."

<Decidedly> "I have heard no such thing! Since I have been put in charge of this tent, I am responsible for everything. You must pay me the money for the bed!"

<Defeatedly> "ookay, I'll pay you soon."

He was brash and I was confused. Five days of miscommunication, uncooperative people and trials to get to a place I thought would bring me some peace was enough. I left the conversation for the next satsangh in tears.

The tears streaming down my face seemed to immediately attract my first new friend. I found myself walking beside a Swedish abhiyasi named Cedric. We walked with each other to the meditation tent introducing ourselves and sharing our initial thoughts about being in the ashram. He had a kind smile and friendly demeanor. We were both new to this whole scene and that was comforting to me. As we approached the meditation tent, we politely said our farewells and took our respective seats, women on one side and men on another.

I looked around to the hundreds of people sitting on the tarpaulin around me. All different faces, different communication styles, different cultures and different motivations for coming to an ashram. Yet, we would all sit in the same pose for the next fourty-five minutes attempting to practice one thing. It was beautiful.

As the days went by, I got into the rhythm of ashram life. My days would begin at around 4:30-5 in the morning. Various alarms would go off in the overseas tent signaling the time for our morning bucket shower and laundry time. The first satsangh would begin at 6 am. The rest of the day would progress with South Indian meals of rassam, curds and rice and other spicy options interdispersed with free time to read, to meet with the spiritual master, and to make new friends. Some days would include air outing to another local ashram and all days ended with an afternoon satsangh and dinner. Most people headed to bed around 9pm while others beamed till late in the night chatting away with new friends.

I met abhiyasi's from all over India and the world. We spoke with each other with interest, occasionally attempting each other's languages. I also met abhiyasi's who were able to relate to my perspective of entering the ashram. They were from New York, Brazil, Fiji, Belgium, Russia, and Sweden. This helpful and willing group interpreted the ashram culture with me. Some of them had been around this type of community all their lives while others had joined only months before. They shared their stories, trials and successes with me. I was not only grateful for their kindness but for their immediate friendship. They were my cross cultural facilitators.

One of the things they helped me to understand was the role of the spiritual Master. I have always been weary of blindly following some old man who tells you how you should live your life. I was equally resistant to the behaviours people had when in his presence. The energy his presence created was unbelievable. It was like the second coming of Jesus. Abhiyasi's hovered over his residence just to get a glimpse of him. If he came out for a talk or a walk in the garden, people would run from across the grounds to the expanding crowd around him. He was a calming and storming presence. You literally felt at ease to be around him but other abhiyasi's would be quick to push you out of the way just to get that glimpse. It was irony at its greatest. I was unsure of what to make of these observations. My new friends empathized with my feelings and reminded me that everyone was at their own stage of growth.

The day New Year's Eve arrived over five thousand people came. They all came to meditate, listen to Master give his New Year's address, and partake in the festivities. The evening was scheduled with several dance performances. My favorite was the final bharath natham dance performed by the Master's granddaughter depicting the story of baby Krishna revealing the entire universe in his mouth to Yashoda. Watching her gracefully move through the steps was hypnotic. It was intoxicating to watch her hypnotically and gracefully move through the steps.

After the performance, I decided to walk around the grounds for a while and talk with Rita. We had been so busy with our own schedules that we had not had a good long conversation. We walked around the grounds reflecting on the past year and stopping to look at the nearby residents decorating their stoops with colorful creations in rangoli. Many people were out wandering, talking with new friends, and waiting to greet the New Year.

The next morning began with the special satsangh lead by the Master followed by his New Years address. He spoke on a theme of a silent new year. We were encouraged to use our minds less, talk less, and listen more. Listen not only to our surroundings but to our hearts. The message filled me with a goal I wish to continually pursue. It tied strongly to my affinity towards reflection and empowering ourselves with the light we all have inside.

Rita and myself at the ashram

# দেবদেবীর মূর্ত্তি কল্পনা

সমর মিত্র

অনেকদিন আগের কথা। কলকাতায় পূজোর ছুটির পর অফিসে পৌঁছতেই আমার একজন প্রবীন সহকর্মী আমাকে দেখতে পেয়েই এগিয়ে এসে বিজয়ার কোলাকুলি করতে করতে গড়গড় করে বলতে লাগলেন, ' এবার পূজোয় দারুণ একটা ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি যা জীবনে ভুলব না, কতজনকে যে বলেছি এর মধ্যে তবুও যেন তৃপ্তি হচ্ছে না, ইচ্ছে করছে পথে ঘাটে চীৎকার করে বলি, শোন সবাই একটা দশ বারো বছরের ছেলের কথা। হয়েছে কি জানেন, অন্যবারের মত এবারেও পাড়ার সব বারোয়ারি ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছি। একটা মণ্ডপে ঠাকুরের মুখের দিকে তাকিয়ে আছি, হঠাৎ কানে এল আমারই ঠিক সামনে দাঁড়ানো দুটো দশ বারো বছরের ছেলের কথোপকথন। একজন আর এক জনকে বলছে, ' প্রায় সব ঠাকুরদের চেহারা মানুষের মত কেন বলতে পারিস ? ' অন্যটি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, ' মানুষ মানুষের চেয়ে সুন্দর আর কিছু কল্পনা করতে পারেনা। অবশ্য দু একটা যে অন্য রকম নেই তা নয়, গণেশের মুণ্ডুটা মানুষের বদলে হাতীর, হনুমান তো বানর, তাহলেও তাদের মূর্ত্তি যেভাবে তৈরি হয় সেগুলো ঐ সব প্রাণীদের চেয়ে অনেক সুন্দর '। ততক্ষণে আমাদের কোলাকুলি, নমস্কার বিনিময় হয়ে গেছে। আমি বললাম, ' ছেলেটির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, একটা কথা আছে না যে সুধীদের চিন্তার মধ্যে সামঞ্জস্য দেখা যায়। স্বামী বিবেকানন্দ অনুরূপ কথা বলেছিলেন, বানররা যদি মানুষের মত চিন্তাশীল হত তাহলে ঈশ্বরের প্রসঙ্গ নিয়ে তারাও ভাবত আর তারা যদি ঈশ্বরের মূর্ত্তি কল্পনা করত তাহলে তা বানরের মতই হত। '

তবে এটা ঠিক যে ঠাকুর দেবতাদের মূর্ত্তি কল্পনা একেবারেই আধুনিক। এক এক দেব দেবীর যে যে মূর্ত্তির সঙ্গে আমরা পরিচিত সেই সবের টুকরো টুকরো ইতিহাস যা পাওয়া যায় তার নির্ভরযোগ্য প্রমান আছে বলে মনে হয়না। বৈদিক মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরা মানুষের মনে নিরাকারের ভাবনা বর্জন করে আকারের সন্ধান যে স্বাভাবিক তা বুঝতে পেরে প্রকৃত গবেষকের মত সেই প্রচেষ্টাকে সরাসরি উপেক্ষা করেননি, বরং সেই প্রশ্নেরও যথার্থ উত্তরের জন্যে গভীর চিন্তা করে যে মন্ত্র দর্শন করেছিলেন, তা আমরা পাই কৃষ্ণযজুর্বেদীয় শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের সেই বিখ্যাত মন্ত্রে ( ৪:১৯ ) -

**ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ**

অর্থাৎ সর্বব্যাপী কীর্ত্তিই যাঁর নাম তাঁর কোন উপমা থাকতে পারেনা। তাহলেও শিব, ইন্দ্র, বিষ্ণু ইত্যাদি নাম বেদে উপনিষদে বিরল নয়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ তো সবটাই শিব বা রুদ্রদেবতার স্তুতিবাচক।

তেমনি কেনোপনিষদে দেবাসুরসংগ্রামে জয়লাভ করে দেবতারা যখন নিজেদের বিক্রমের বড়াই করছিলেন তখন তাঁরা যাঁর শক্তিতে শক্তিমান হয়ে বিজয়ী হয়েছেন তাঁদের সেই শিক্ষা দেবার জন্যে নিরাকার ব্রহ্ম সাকার হয়ে তাঁদের সামনে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তবে দেবতারা তাঁকে যক্ষ বলে বর্ণনা করলেও তাঁর রূপের কথা কিছু বলেননি যেমন ঐ সব দেবতাদের রূপেরও কোথাও কোনরকম বর্ণনা নেই। আবার একেবারে যে নেই তাও বলা যায় না কারণ দেবতাদের সামনেই যক্ষ অন্তর্হিত হলে সেখানে তৎক্ষণাৎ অতিশয় সুশোভনা এক দেবী আবির্ভূতা হলেন হৈমবতী উমা বলে যাঁর পরিচয় দেওয়া হয়েছে উপনিষদে। তবে এই সব কাহিনীই রূপকভিত্তিক বলে শোনা যায় কারণ বৈদিক অভিধান অনুযায়ী দেব দেবীর অর্থ দিব্যশক্তি। দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ ইত্যাদি যে যে শক্তিতে সম্ভব হয় তাদের সব আলাদা আলাদা দেবতার নাম। বায়ু, অগ্নি, আদিত্য ইত্যাদিও তাই বৈদিক দেবতা বলে পরিচিত হয়েছেন। আবার দেবী শব্দটির ব্যবহারও অপ্রতুল নয় কারণ বৈদিক ভাষাও অন্যান্য অনেক ভাষার মতই লিঙ্গভিত্তিক। তাই দেব শব্দও যেমন আছে পাশাপাশি দেবী শব্দই বা থাকবে না কেন ?

যেহেতু নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্ম অধিকাংশ মানুষের পক্ষে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করা সম্ভব নয় সেইজন্যে বেদে ব্যবহৃত দেব দেবী শব্দগুলি একটু একটু করে মানুষের কল্পনায় রূপায়িত হয়ে উঠেছেন। কৃষ্ণযজুর্বেদীয় মহানারায়ণ উপনিষদের দ্বিতীয় অনুবাকে দুর্গাসূক্ত এই নাম দিয়ে কয়েকটি শ্লোক আছে। তার মধ্যে দুর্গানি, দুর্গহা শব্দের সঙ্গে দ্বিতীয় শ্লোকে পাশাপাশি দুর্গা আর দেবী এই দুটি শব্দই আছে। সেই শ্লোকটি হল

তাম্ অগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্।
দুর্গাং দেবীং শরণং অহং প্রপদ্যে সুতরসি ওঁ তরসে নমঃ।

শ্লোকটির অর্থ হল সেই বৈরোচনী বা পরমাত্মার শক্তি যিনি কর্মের সঙ্গে তার ফল যোগ করেন, বিপদ থেকে যিনি ত্রাণ করেন, সেই দুর্গা দেবীকে আমাদের বিপদ অর্থাৎ সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ করার প্রার্থনা জানিয়ে প্রণাম করি। প্রণাম করতে গেলে অবশ্য একটা রূপ কল্পনা করলে সুবিধে হয়, এখানে তাঁকে জ্যোতির্ময়ী তেজস্বরূপা বলে কল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু এ থেকে তাঁকে আমাদের দশভুজা দশপ্রহরণধারিণী মা দুর্গা বলা যাবে না। এই শ্লোকের দুর্গা দেবী হলেন সেই দিব্য শক্তি যাঁর কৃপায় আমরা নানাবিধ দুর্গতি থেকে পরিত্রাণ পাই।

দুর্গা এবং আরো অনেক দেবদেবীদের সঙ্গে বেদে সরস্বতী শব্দটিও পাওয়া যায়। ঋক্‌বেদের প্রথম মণ্ডলের দশ নং সূক্তের দ্বিতীয় শ্লোকটি দেবী সরস্বতীর কাছে প্রার্থনার একটি সুন্দর মন্ত্র -

**পাবকাঃ নঃ সরস্বতী বাজেভির্বাজিনীবতী। যজ্ঞং বষ্টু ধিয়াবসুঃ।**

মন্ত্রের সরল অর্থ হল যে পাবকাঃ বা অগ্নি যেমন সব কিছু পরিশুদ্ধ করেন তেমনি এই দেবী পতিতপাবনী অর্থাৎ কলুষ বা অজ্ঞান বিনাশ করেন। সর্বদা দারিদ্র্যনাশিনী জয়প্রদায়িনী জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বা বাজিনীবতী আমাদের যজ্ঞকে সার্থক করে তুলুন। যে যেমন বুদ্ধিবৃত্তির বা বিদ্যাচর্চায় মনোযোগী হবে, তিনি সেই অনুযায়ী তাকে সুমেধা দান করবেন। ধিয়াবসু, এই বিশেষণই তাঁর প্রকৃত স্বরূপের পরিচয় দিচ্ছে। সরস্বতী ( সর শব্দের অর্থ জল ) নামে ভারতবর্ষে অধুনা বিলুপ্ত একটি নদী ছিল। সেই নদীর উপকূলে জনবসতিও যেমন গড়ে উঠেছিল তেমনি মুনি ঋষিদের তপস্যার অনুকূল পরিবেশও ছিল। সেই দিক দিয়ে শ্লোকটির সহজ অর্থ হল দেহপরিশুদ্ধকারিণী অন্নদাত্রী দেবী সরস্বতী আমাদের যজ্ঞে পরিতুষ্ট হোন।

কিন্তু এই সব মন্ত্রে কোন মূর্তির বর্ণনা নেই। বেদের পরবর্তীকালে পুরাণে দেবদেবীর মূর্তি পরিগ্রহ করার কাহিনী আছে। চণ্ডীর মধুকৈটভ বধের অধ্যায়ে মেধাঋষি বলছেন সেই দেবী মহাকালী বা মহামায়া নিত্যা, যদিও এই জগৎই তাঁর মূর্তি। তবুও দেবকার্য্য সিদ্ধ করার জন্যে বারবার তিনি আবির্ভূতা হন। গীতায় শ্রীভগবানও যেমন ধর্মসংস্থাপন করার জন্যে যুগেযুগে আবির্ভূত হবার কথা বলেছেন।

তেমনি মহিষাসুরমর্দিনী, চণ্ডীতে যাঁর নাম মহালক্ষ্মী ( যিনি অষ্টাদশভুজা ), তিনি মহিষাসুরের অত্যাচারে জর্জরিত দেবতাদের শক্তি ঘনীভূত হবার ফলে উৎপন্না হলেন। সেই দৃশ্য বর্ণনা করেছেন চণ্ডীর রচয়িতা মার্কণ্ডেয়মুনি একটি অনবদ্য শ্লোকে যার দ্বিতীয় লাইনটি হল - **একস্থং তদ্ অভূৎ নারী ব্যাপ্ত লোকত্রয়ং ত্বিষা** - অর্থাৎ একীভূত শক্তি থেকে ত্রিভুবন আলোকিত করে এক নারী আবির্ভূতা হলেন। এখানে মুনি, দেবীর বদলে নারী শব্দটি ব্যবহার করলেও এই দেবীকে মানবী বলা যায়না। কারণ মুনি পরে দেবীর বিশদ্ বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন যে তাঁর পদভারে ধরণী আনত, গগনস্পর্শী তাঁর মাথার মুকুট, তাঁর বিশাল ধনুকের গুণ আকর্ষণে বিশ্ব আলোড়িত, বিস্তৃত সহস্রভুজে দিক দিগন্ত আবৃত হয়েছে।

চণ্ডীর তৃতীয় আখ্যায়িকাটি শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে দুই অসুরের বিনাশ সাধন করার জন্যে দেবতাদের কাতর প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে যে দেবী আবির্ভূতা হয়েছিলেন তিনি মহাসরস্বতী নামে পরিচিতা। এই দেবী চতুর্ভুজা, শঙ্খ চক্র ও ধনুর্বাণধারিণী। আমাদের বীণা পুস্তকধারিণী সরস্বতীর কল্পনা কোথা থেকে কবে এসেছে জানা নেই। তবে মহানারায়ণ উপনিষদেরই চতুর্বিংশতি অনুবাকের প্রথম শ্লোকে ইন্দ্র, সরস্বতী আর অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের কাছে মেধা কামনা করার দৃষ্টান্ত রয়েছে, যথা - **মেধাং ম ইন্দ্রো দদাতু মেধাং দেবী সরস্বতী .....**। সম্ভবত উপনিষদের এই ধরণের বর্ণনা থেকে বাঙালীদের সরস্বতীকে জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলে বিশেষভাবে অর্চনার প্রথা চালু হয়েছে।

সার কথা হল দেব দেবীর কোন নির্দিষ্ট রূপ থাকতে পারেনা। তবে সেই নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মই আবার সাকার সগুণ হন। দেবীভাগবতের সেই বিখ্যাত শ্লোকটি ( ৫:৮ )-

**সেয়ং শক্তিঃ মহামায়া সচ্চিদানন্দরূপিণী,**
**রূপং বিভর্তি অরূপা ভক্তানুগ্রহহেতবে।**

সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের শক্তি মহামায়াও সচ্চিদানন্দরূপিণী। অরূপা হয়েও ভক্তদের অনুগ্রহ করার জন্যে তিনি রূপধারণ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ, রামপ্রসাদ, বামাক্ষেপা ইত্যাদি মহাসাধকেরা তাঁদের নিজের নিজের ইষ্টমূর্তির ধ্যানে তন্ময় হয়ে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। এঁরা আশ্বাস দিয়েছেন যে সাধনভজনহীন ব্যক্তিরও যদি ভগবানে বিশ্বাস থাকে তবে তিনিও সেই ভগবান মূর্ত বা অমূর্ত যাই হোন না কেন তাঁর কাছে অসঙ্কোচে সকল কামনা নিবেদন করতে পারেন।

# Ushering in the New Year

*Sutapa Datta*

WHILE traveling through India, Mark Twain had a wonderful way of describing the average Indian's propensity to celebrate every joyous occasion. He said, "Although the week has only seven days, Indians tend to celebrate eight festivals every week!"

West Bengal, the gateway to the exotic east - is a land of sheer passion, poetry, and natural beauty celebrating every season of the year. Bengalis have another way of saying the same thing: *Baro maashe tero pabbon* (celebrating thirteen festivals in twelve months).

Baishakhi heralds the beginning of the Bengali New Year. It is accompanied with the arrival of spring in preparation for the active summer season. The month of Baishakh also marks the birthday of Rabindranath Tagore whose creations have captivated us for years. For Tagore, Poila Baishakh used to be "more than a festival", as it was an affirmation of faith in the process of cyclical regeneration. Since his time, students at Santiniketan have been ushering in the new year with group dances, music and poetry recitations. In West Bengal, the New Year is called Nabo Barsha and is celebrated on April 14 each year. In Bangladesh, this day is called Poila Baishakh and is celebrated with great zeal.

It is, however, the feeling of hope and renewal that binds all celebrations, regardless of what individual communities might want to call the festival. It is an occasion not only to express and expand, but also to rejoice the conjoining of the temporal and timeless.

During this time, different communities have their own presiding deities whose blessings are invoked on the occasion. Maharashtrians pay homage to their ancestor (the primordial man). In central and northern India, family gods *(kula devtas)* are worshipped. In other places, prayers are offered to village or tribal Gods.

In urban areas, usually temples of Lord Ganesha and Goddess Saraswati draw large crowds on Baishakhi. Both are presiding deities for auspicious beginnings — be it in the refinement of sensibilities, sharpening of intellect or in the attainment of excellence in one's chosen field.

Saraswati holds an edge over Ganesha in terms of popularity with the youth, as she is also the goddess of learning. The association of Saraswati with Baishakhi goes back to the Vedic times when the former was believed to be in form of a river. Later, when personified as a goddess, it is said that she came sailing down the river, playing a veena, halting on her way at a place called Kurukshetra. That was on the first of Baishakh.

Great poets like Kalidas, Amir Khusro and even Gurudev Rabindranath Tagore have celebrated these sentiments, associating them with the coming of spring. According to Amir Khusro, Baishakh is the time when nature wears yellow and man longs for a union with his beloved, when "the languor

and lassitude of earlier days is replaced by spring."

Tagore, the Noble laureate from India, was so inspired by the spirit of spring, that he decided to introduce Vasanta Utsav (the festival of spring), in his Visva-Bharati University at Santiniketan. On this day the students and the youths of the institution, attired in colorful dresses like yellow, celebrate Holi in a very special way. A number of cultural programs, which include group choreography, songs, and dance, are staged. After the program is over, the whole university plays Holi with abeer. In the course of time, Vasanta Utsav has become a milestone of Bengali culture, and has also drawn interests from international tourists as well.

The tradition continues to this day with new clothes, distribution of sweets and exchange of greetings forming an integral part of the Baishakhi festivities. A carnival-like atmosphere prevails in many Indian cities with cultural programs, singing of religious hymns and sports events being held on the occasion.

Clearly, the belief is that the more joyous the day turns out to be, the rest of the year will follow in a similar vein. Invoking divine blessings is based on the same principle: the more benevolent the gods turn out to be, the more blessed will one be for the rest of the year.

*Artwork & Poems by Rabindranath Tagore*
*Courtesy: Visva-Bharati Publications*

# BAISAKHI

*Geeta Chadha Yadav*

The beating of drums sets the mood, the festive rhythm pulls in everybody to put their hands in the air to swing, rejoice and dance to the tune of the festivity that marks *Baisakhi*. *Baisakhi* is celebrated on 13 April with great zest and fervor especially in Punjab and it marks the beginning of the solar year. This day calls for dual celebration because Sikhs celebrate *baisakhi* as New Year along with the commemoration of the forming of Khalsa (Sikh brotherhood) by Guru Gobind Singh in 1699. The energy and enthusiasm of the people is absolutely mind-blowing and infectious. Farmers clad in colorful *lungi- kurtas* with turbans and decked up women and children glow with contentment and their eyes wander with a sense of fulfillment, its time to thank the god for the good harvest and pray for a better crop the coming year.

I was lucky to be a part of this festive occasion as a teenager. My father and I had gone to Jamsherkhas near Jullunder to attend a wedding as April 13th is considered the most auspicious day for any occasion. We too made a great duo, dad proudly wore a pink turban with a *pathani salwar suit* and I, a little clumsy in a borrowed magenta and green *salwar - kameez* adorned me with great enthusiasm. Merry making and feasting mark the baisakhi fairs that form the most colorful part in the villages. We matched our steps with the men folk dancing to *bhangra* beats and *gidda;* another folk dance that showcased the energy levels of the ladies. Wrestling matches, Giant wheels and merry- go- rounds took us to the soaring heights of ecstasy.

The religious fervor is no less as the *Granth Sahib,* the holy book of the Sikhs is carried in a procession led by the *panj pyaras* who are symbolic of the five disciples chosen by Guru Gobind Singh as embodiment of the guru himself. *Kirtans* and recitals from the Granth Sahib take place in Gurudwaras that becomes a hub of devotees from all faiths. The best part is that these devotees volunteer help in carrying out the day to day tasks of the gurudwaras like preparing *Prasad(offerings)* and *langer*(community lunch) for the people. And in true Indian spirit on this day water is drawn from all sacred rivers of India and poured in the tank surrounding the Golden Temple in Amritsar.

*'Nanak nam Charhdi Kala, tere bhane Sarbatt Ka Bhala'*- May Thy Name, Thy Glory, forever triumphant, Nanak and in Thy will, may peace and prosperity come to one and all.

*Errata (Sharadiya Anjali 05): Geeta Chadha Yadav is a not an employee of The Indian Express, she is a freelance writer. She writes human interest stories for newspapers and magazines and focuses mainly on adolescent issues. Worked closely with Politics India and is the co-author of "How to Help & Understand Adolescence, A Friendlier Approach", published by Student Aid Pub., reviewed by The TOI, The Hindu.*

# Kids' Corner

## I Am Spring

Suparna Chaudhury

I am Spring.
I bring the flowers that bloom,
I bring the honeybees that zoom,
For I am Spring.
I bring the lush, green grass
Under your feet,
I bring the birds that
Like to tweet.
And I bring the rosy color
Back to your cheeks.
And luckily, I stay with you
For weeks!
I've come to bring back
Mother Nature's ring.
Yes, I've come.....
I am Spring.

## I Wonder Why ...

Kriti Lodh

I wonder why ...
Flowers are so bright,
And stars twinkle in the night.

I wonder why ...
The grass is so green,
And some people are so mean.

I wonder why ...
Kittens like to play,
Why there is a month called May?

I wonder why ...
Puppies are so cute,
And fish are so mute.

I wonder why ...
The sky is so blue,
How birds fly I have no clue.

I wonder why ...
The moon is so white,
Why does it give a lot of light?

I wonder why ...
My mom is so nice,
But she does not like mice.
I wonder why ...
I wonder why ...

## LITTLE MISTU IN BIG CHICAGO

Ananya Ghose

The trip started in the morning by going to the airport. Boarded the plane to Memphis, TN. Then boarded the plane to Chicago. From Chicago Airport took the train to the Hotel. The name of the hotel was Marriott.

First we went to visit the Hancock tower and ate at the Cheesecake factory. Then we visited the navy pier. At the navy pier we had lot of fun - took rides in the Ferris wheel, Wave Swinger and horse riding. In the night we ate Ice cream and watched fireworks in the sky. It was so good.

Next day we visited the Adler Planetarium and ate in the café. I ate a donut, a big chocolate chip cookie.

Then we went to a park, with a water tower. It was so cool. The towers had faces on them. One face was a boy, another was a girl. Next we again went to the navy pier to have more fun.

We also went to the Children's Museum of Chicago. We ate in the Pizzarina Uno.

Next day we took the train to the airport. Our trip was over. I said GOODBYE CHICAGO.

# Weird But True

*Facts Compiled by Tinny Datta*

- A tiger's skin is striped like it's fur

- There are 293 ways to make change for a dollar

- 1,000,000,000,000,000, ants live on earth

- The bumblebee bat weighs less than a nickel

- Some honeybee queens can quack like a d

- Your eyes produce a teaspoon of tear in an hour

- A flea can jump hundred times it's body length

- Days are longer than years on the planet mercury

- It is impossible to sink any one in the DEAD SEA

- Opposite sides of dice always add up to the number seven

- Eating shrimp can turn white flamingos pink

The Empire state building was built with ten million bricks

- The Bahamas once had an under-water post office

Sharks have 8 senses - while humans have 5

# Riding on a Magic Carpet

*Novonil Banik*

It's amazing to ride a magic carpet around the world. Well, one day I was going to play in the basement when I saw a rusty, ancient, fire-colored carpet. I had never seen it in my whole life! When I touched it, it glowed like gold. I thought to myself, "It's a magic carpet!"

When I got on it, I said to the magic carpet, "Let's go to France." A second later the magic carpet was soaring like a bird and going as fast as a jet. After I got to France, I looked at the Eiffel Tower and explored France.

Then I got on my magic carpet and went to Alhambra. When I saw all the food and food stalls, my mouth was watering like a hungry dog. When I thought nobody was looking, I swiftly took a piece of bread. I was about to devour it down when five heavily armored guards with curved swords chased me like swift lions, but I bolted to my magic carpet and zoomed away to Greece.

At Greece I glanced at the Greek statues of the Gods and Goddesses, went to the temple of Zeus, and saw the Olympic stadium.

Then I got on my magic carpet and told it to go to Mt. Denali in Alaska. When I got there I stood for two seconds when an avalanche hit me and I was falling 3,000 miles per hour, but my carpet saved me from doom. I told it to take me home. When I got home, my parents were furious. Do you know what my punishment was? I wasn't allowed to play anything and my parents would sell my carpet on eBay, so I never saw it again.

# All about Me

*Atul Lodh*

Hi, My name is Atul,
I like to go to school.

My mouth never stays shut,
Because I am a wise nut.

I have very big eyes,
So I see different than other guys.

Video games I can play all day,
If I had my very own way.

Piano is what I play,
It sounds good
This is what people say.

I like to play baseball,
'Cause it's my favorite sport after all.

Science to me is a lot of fun,
Experiments I enjoy a ton.

Swimming laps in the pool,
On Fridays I do after school.

I am special you can see,
'Because I'm an Indian who's free

# NIL AND ABEL GO MIAMI

*Nil Bhattacharyya*

One day our parents were planning to go on a 20 day cruise to the Bahamas. Our little brother, Max, 11 years old, was going to Colorado to visit his friend. We had to drop him of, at the airport, at 6:00. His flight was to leave at 6:30. Then Abel said," I'm hungry! I'm going to get a corn dog!" "Be back quickly Abel!" Nil said. One hour later [from 5:00 to 6:00] "Where were you? You said just a corn dog!" Nil shouted. "I also had a king-sized drink"! Replied Abel. "Let's go"! Nil said. We got in the car, and got into the airport, barley. "Hello! We need a ticket to Colorado!" Nil said, catching his breathe. "There you are!" What we didn't notice is the ticket said Miami, FL. Then, we found out the truth. "Excuse me; we need 2 tickets to Miami!" Nil said. "We're going to Miami?" Abel said. "We're going to Miami!" Nil replied. We got on the plane. Nil sat in row 27B, and Abel sat in 27A. When we were getting down, a person fell on Abel. "Get off me!" Abel screamed. Then, we got off the plane and waited.

Max eventually called and said he was at the Seashell Inn. This was the best hotel in Miami. We rushed over and found him. He was at the top floor, and it was HUGE! Max went down to the spa, after a while. Then, some guy came in, but we didn't notice. Abel opened his laptop and hooked it up with his mp3 player to listen to music. He saw pictures of illegal drugs. "Hey Nil, check this out." Said Abel "Illegal drug pictures?" Said Nil "Give it nicely or the hard way" Said the guy. "No Way" Said Abel. "You're selling illegal drugs!" said Nil. The guy glared at us. "RUN!" Nil yelled. We got down to the lobby and saw a shiny, new, red, roofless Mustang. We grabbed it and Nil, who was in the driver's seat said, "Get in!" We rushed forward, going at 80 mph. Then, the "cops" caught us.

They were fake, but we thought they were real. They worked for that guy, who's name was Bert. They captured us and threw us in a cell when we got to there factory. We managed to escape and destroy their machine, but they tied us up in ropes. Meanwhile, Max came and noticed we were gone. He found a piece of paper that said 14842. He rushed over and helped us by being quiet. He left to call the real cops, "Hello? I need cops at 14842, now!" Said Max. The real cops came fast. Meanwhile we were fighting off the bad guys with anything we could find. The real cops captured the fakes and Bert, who was on the most wanted list. The cops let us have the Mustang. We dropped Max off at the airport and checked his ticket, and said bye. We had 18 days left, so we had fun in MIAMI.

# অপরূপ কেরালা : ফুলের উৎসব ওনাম

*রোহণ কুদ্দুস*

কেরালার প্রধানতম উৎসব নিয়ে লিখতে ব'সে মনে পড়ে যাচ্ছে বাংলার দুটো উৎসবের কথা। প্রথমটা হল দুর্গাপুজো। আর দ্বিতীয়টা হল নবান্ন। কারণ ব্যাপ্তি আর প্রাণমুখরতায় এ উৎসব বাঙালির প্রিয় 'দুগ্‌গাপুজো'র সঙ্গে তুলনীয়। আর যেহেতু এটি ফসল ঘরে তোলার উৎসব, তাই ভেসে আসে পাকা ধানের ঘ্রাণ -- নবান্নের পিঠেপুলি-স্মৃতি। কেরালার মানুষজন নিজেদের সংস্কৃতিকে এত সুন্দরভাবে আঁকড়ে ধরে আছেন, যে মাঝে মাঝে বাংলার বর্তমান বিস্মৃতপ্রায় নবান্নের জন্যে মন খারাপ করে।

মালায়ালম বর্ষপঞ্জী 'কোলা বর্ষম'-এর প্রথম মাস চিঙ্গাম-এ ওনাম পালিত হয় (ইংরাজী ক্যালেন্ডার হিসাবে অগাস্ট-সেপ্টেম্বর)। মানুষজনের ঘরে ফেরা, দোকানে দোকানে নতুন জিনিসপত্রের স্তুপ, সাধারণ মানুষের মুখ উজ্জ্বল করা হাসি -- উৎসবের পরিচিত ছবিটা অগাস্টের শেষ থেকেই দেখতে পাওয়া যায়। তাহলে ওনাম আলাদা কোথায়? ওনামের বড় বিশেষত্ব হল এটি কোনো ধর্মীয় উৎসব নয় -- কেরালার আপামর জনসাধারণের উৎসব। একটা সামাজিক উৎসব একটা রাজ্যের প্রধান উৎসব হিসাবে পালিত হয়, এমন দৃষ্টান্ত কিন্তু খুব বেশি নেই।

ইতিহাস অনুসারে ওনাম পালনের প্রাচীনতম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় খ্রীষ্টীয় নবম শতকের শুরুতে। কুলশেখর পেরুমলের রাজত্বে একমাসব্যাপী উৎসব পালনের উল্লেখ আছে। বর্তমানে ওনাম পালিত হয় দশদিন ধরে। প্রতিটা দিনের সঙ্গেই জুড়ে আছে কিছু উপকথা।

মোটামুটিভাবে, গল্পটা এরকম। কেরালায় একসময় শাসন করতেন রাজা মহবলী। তাঁর রাজত্বে অখন্ড শান্তি এবং সমৃদ্ধিতে প্রজারা ছিল মহাসুখে। মহাবলীর এই সুনিষ্ঠ রাজ্যশাসনে ভগবান বিষ্ণু ঈর্ষান্বিত হ'য়ে তাঁর পরীক্ষা নিতে বামন অবতারে অবতীর্ণ হন। তার পরের গল্প তো সকলেরই জানা। বামন মহাবলীর কাছে কিছুটা জমি চাইলেন, যতটা জমি তাঁর তিনটে পদক্ষেপের সমান হবে। দানবীর রাজা সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুর করলেন সে আবেদন। তখন সে বামন বিশাল আকার ধারণ ক'রে প্রথম পদক্ষেপে আকাশ এবং দ্বিতীয় পদক্ষেপে সমস্ত ভূমি অতিক্রম করলেন। তৃতীয় পদক্ষেপের জন্যে সত্যনিষ্ঠ মহাবলী নিজের মাথা পেতে দিলেন। বামনের পায়ের চাপে তিনি পাতালে প্রবেশ করলেন। অবশ্য বিষ্ণু তাঁর মহানুভবতায় খুশি হ'য়ে বর দিলেন বছরের একটা নির্দিষ্ট সময় রাজা তাঁর প্রজাদের দেখতে আসতে পারবেন মর্ত্যে। ওনাম হল সেই সময়। কেরালার মানুষের বিশ্বাস মহাবলী রাজা তাঁর প্রজাদের আশীর্বাদ করতে এই সময় মর্ত্যে অবতীর্ণ হন।

এ কাহিনীটাই একটু অন্যভাবেও শোনা যায়। মহাবলী সুশাসক হ'লেও অহংকারী ছিলেন। তাই দরিদ্র ব্রাহ্মণ বামন যখন তাঁর কাছে কিছু জমি প্রার্থনা করেন, তখন রাজাসুলভ অহং-এ তিনি বামনকে ইচ্ছেমত জমি নিতে বলেন। তারপর আগের কাহিনীর মতোই ঘটনা। অবশ্য এটা শাপে বর হ'য়ে দাঁড়ায় মহাবলীর জন্যে। পাতাল প্রবেশের ফলে জীবন-মৃত্যুর চক্র থেকে চিরতরে মুক্তি পান তিনি। এই কারণেই ওনামে নতুন পোশাকে নতুন ক'রে সততা, ন্যায় এবং মানবিকতার শপথ নিয়ে নতুন বছর শুরু করে মানুষ।

ওনামের এই গল্পগাথা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এরাজ্যের অধিবাসীদের মুখে মুখে ঘুরছে। অনেক চেষ্টা ক'রেও এ সম্পর্কে কোনো প্রামাণ্য লিখিত তথ্য পাইনি। তাই ওনামের উপকথাগুলি বেশ কয়েকজন ঠাকুরদার ঝুলি থেকে সংগ্রহ করেই লিখছি। অবশ্য দিনগুলি পালনের যে বর্ণনা এখানে দেব সেগুলি কেরালায় থাকার সুবাদে চাক্ষুষ করার সৌভাগ্য হয়েছে।

### আথাম

ওনামের প্রথম দিন হল আথাম। সকালে তাড়াতাড়ি স্নান ক'রে বানানো হয় প্রাতরাশ। সেদ্ধ কলা এবং পাঁপড় সাজিয়ে রাখা হয় একটি পাত্রে। ওনামের পরবর্তী দিনগুলোতে সেটি একইভাবে রাখা থাকে। বাড়ির সামনে ছোটো গাছের ডালে বাঁধা হয় দোলনা। ফুল আর লতায় সাজানো সেই দোলনায় দোল খেতে বাচ্চারা গাইতে থাকে ওনামের গান উঞ্জাল আর ওনাপ্পাট্টু।

তবে আথামের বড় আকর্ষণ হল পুকালাম বা আথাপু। মেঝেতে খড়ি দিয়ে বিভিন্ন নক্‌শা এঁকে তাতে নানা রঙের ফুলের পাপড়ি ছড়িয়ে বানানো হয় অপূর্ব কার্পেট। আমাদের কলেজে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের মেয়েরা পুকালাম বানানোর কাজে রীতিমত প্রতিযোগিতা শুরু করে।

আথামের অন্য আর এক আকর্ষণ আথাচামিয়াম বা দীর্ঘ শোভাযাত্রা। কোচির ত্রিপুনিথুরা ফোর্ট থেকে আগেকার দিনে মহারাজা শুরু করতেন সে যাত্রা। আর একটি শোভাযাত্রার সূচনা হত কালিকটের জামোরিনদের রাজপ্রাসাদ থেকে। এখন রাজা-রাজড়া নেই। সাধারণ মানুষজন নৃত্যবাদ্য সহযোগে ওনামের সূচনা ঘোষণা করতে বেরিয়ে পড়েন রাস্তায়। সুদৃশ্য সাজ পরা হাতির দল আর কেরালার নিজস্ব লোকসংস্কৃতির প্রদর্শনে এক নয়ানাভিরাম সমারোহের স্বাক্ষী হ'তে হয়।

### চিথিরা

চিথিরা দ্বিতীয় দিন। মেয়েদের প্রধান কাজ পুকালামের শুকিয়ে যাওয়া পাপড়ি সরিয়ে নতুন রঙের ফুল যোগ করা। পরিকল্পনা চলে বাকী দিনগুলোর জন্যে। লম্বা ফর্দ বানানো হয় কেনাকাটার। বাড়ির ছোটোরাও তাদের দীর্ঘদিনের দাবিদাওয়া যোগ করতে থাকে সে তালিকায়। ওনাম সকলের জন্যেই ইচ্ছাপূরণের উৎসব।

## চোধি

ওনামের তৃতীয় দিন চোধিতে চলে কেনাকাট। দোকানে দোকানে অসম্ভব ভিড়। সেরকম কোনো প্রথা চোধির জন্যে নেই। কিন্তু পুকালামের ব্যাসার্ধ বেড়েই চলে ক্রমাগত।

## বিশাখম্

বাড়ির মহিলাদের জন্যে বিশাখম্ খুব গুরুত্বপূর্ণ। শেষদিনের মহাভোজের প্রস্তুতি হিসাবে পাঁপড়, আচার ইত্যাদি বানানোর ঘটা পড়ে যায়। এদিন কেরালার বিভিন্ন জায়গায় পুকালাম অর্থাৎ ফুলের কার্পেট বানানোর প্রতিযোগিতা হয়। নামকরা বিভিন্ন পুকালাম-শিল্পী অংশগ্রহণ করেন। ওনাম প্রকৃত অর্থেই হ'য়ে ওঠে ফুলের উৎসব।

## অনিঝাম

পঞ্চম দিনে সত্যিই সাজো-সাজো রব ওঠে। অনিঝাম উপলক্ষে ভাল্লামকেলি (নৌকাদৌড়) অনুষ্ঠিত হয়। সরু সরু নৌকা (স্নেক বোট) যেগুলি এই রাজ্যে চুন্দান ভাল্লাম নামে পরিচিত সেগুলি ব্যবহৃত হয় প্রতিযোগিতায়। শাল বা কদম কাঠে বানানো নৌকাগুলি প্রায় একশো ফুট লম্বা হয়। নৌকার গায়ে থাকে চিত্র-বিচিত্র রঙীন নক্শা আর রূপোর তৈরি গয়না। সাধারণতঃ এক-একটি নৌকায় চারজন ধরেন হাল আর একশো থেকে একশো পঁচিশজন থাকেন দাঁড় বাওয়ার জন্যে। এছাড়া পঁচিশজন নৌকা বাওয়ার গান বাঞ্চীপাট্টু গেয়ে দাঁড়ীদের উৎসাহিত করার জন্যে থাকেন। দলগত ঐক্যের ওপর নির্ভর করে সাফল্য। এমনকি মাত্র একজনের ভুলে নৌকা উলটে গেছে এমন উদাহরণ বিরল নয়। প্রতিযোগিতার আগের দিন নৌকাগুলো জলে নামিয়ে বিষ্ণু ও মহাবলীর পুজো ক'রে নেওয়া হয়। সাধারণতঃ চল্লিশ কিলোমিটারের পাল্লায় এক-একটা নৌকাদৌড় হ'য়ে থাকে। প্রতিযোগিতার দিন নদীর তীরে জমায়েত হন অগণিত মানুষ। উৎসাহিত করতে থাকেন প্রতিযোগীদের। উৎসবের এমন বিচিত্র রূপ -- গতি আর আনন্দের এমন সাযুজ্য বোধহয় ঈশ্বরের রাজ্যেই দেখা যায়। কেরালার বেশ কয়েকটি জায়গায় হয় এই প্রতিযোগিতা। এ প্রসঙ্গে নাম করতে হয় নেহরু ট্রফি বোট রেস, রাজীব গান্ধী বোট রেস, কোট্টায়াম মহাত্মা বোট রেস, কোট্টাপুরাম বোট রেস, কুমারানাসান স্মারক জলোৎসবম্ প্রভৃতির।

তবে সবচেয়ে প্রাচীন আম্বালাপুঝার শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরের নিকটবর্তী চম্পাকুলাম হ্রদের ভাল্লামকেলি। কথিত, চম্পাকেশরীর রাজা দেবনারায়ণ প্রধান পুরোহিতের নির্দেশে আম্বালাপুঝায় একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সেই মন্দিরের বিগ্রহ হিসাবে পারিষদবর্গ কুরিচির কারিকুলাম মন্দিরের কৃষ্ণমূর্তিটি নির্বাচন করেন। কারণ ওই মূর্তিটি কৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর সখা তৃতীয় পান্ডবকে উপহার দিয়েছিলেন। তাঁরা পরিকল্পনা মতো কুরিচিতে যান এবং মন্দির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা ব'লে মূর্তিটি নিয়ে রওনা দেন। পথে চম্পাকুলাম হ্রদের তীরে তাঁরা রাত্রিযাপন করেন এবং বিগ্রহটির পূজা করেন। পরেরদিন ঐ এলাকার মানুষ বর্ণাঢ্য নৌকাযাত্রার মাধ্যমে বিগ্রহটিকে মন্দিরে পৌঁছে দেন। এই ঘটনার স্মরণে চম্পাকুলাম হ্রদে আজও নৌকাদৌড় হ'য়ে থাকে। এছাড়াও বিখ্যাত আরানমুলার দু'দিনব্যাপী ভাল্লামকেলি। লোককথা অনুসারে নাম্বুদিরি বংশের এক ব্রাহ্মণ পম্পা নদীর তীরে স্নান-আহ্নিক সেরে দরিদ্র ব্রাহ্মণ ভোজন করানোর ইচ্ছা করেন। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর কাউকে না পেয়ে তিনি শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ নেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তিনি এক ব্রাহ্মণ বালককে সামনে দেখতে পান। পরম যত্নে তাকে ভোজন করানোর পর সে অদৃশ্য হ'য়ে যায়। শেষবার তাকে দেখা যায় নিকটবর্তী আরানমুলা মন্দিরে। ব্রাহ্মণের দৃঢ় ধরণা হয় ঐ বালক শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। ভক্তিতে আপ্লুত হ'য়ে তিনি প্রতিবছর ওনামে আরানমুলা মন্দিরে একান্নজন ব্রাহ্মণের জন্যে নৌকায় ক'রে খাবার নিয়ে যেতেন। সেই নৌকাকে জলদস্যুদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে সঙ্গে যেত আরো অনেক নৌকা। সেই থেকে শুরু হয়েছে আরানমুলার নৌকাদৌড়।

আলাপুঝা থেকে ৩৫ কিমি দূরে অবস্থিত পায়িপ্পাড় হ্রদের নৌকাদৌড়ের পেছনে যে গল্পটি আছে, সেটিও মন্দির এবং বিগ্রহ সংক্রান্ত। সুব্রমনিয়া স্বামীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করার পর প্রধান পুরোহিত আয়াপ্পা স্বপ্নে দেখেন ঐ হ্রদের মাঝে আছে বিগ্রহ। গ্রামবাসীরা ডুবুরী নিয়ে গিয়ে সেটি তুলে আনেন মহা সমারোহে। সেই উপলক্ষে এখনও তিনদিন ধরে অনুষ্ঠিত হয় পায়িপ্পাড় জলোৎসবম্।।

## থিকেটা

ষষ্ঠ দিন থিকেটায় সাধারণতঃ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। কেরালার নিজস্ব নাচগানে মুখরিত হ'য়ে ওঠে আকাশ বাতাস। একত্রিত হ'য়ে পরিবারের মানুষজন মেতে ওঠেন ঘরোয়া মজলিশ আর আড্ডায়।

## মুলাম, পুরাদাম আর উথ্রাদাম

যথাক্রমে সপ্তম, অষ্টম ও নবম দিন। উত্তেজনা বাড়তে থাকে -- থিরুওনামে মহাবলী আসবেন যে। শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি তাই ঘরে ঘরে। 'সব ঠিকঠাক হল তো? পুকালামটার নকশাটা একটু অন্যরকম হ'লে কত না?'

## থিরুওনাম

অবশেষে এল থিরুওনাম। মহাবলী আসবেন আজ। ভোর চারটে থেকে চলে প্রস্তুতি। উঠোন নিকানো হয় গোবরজলে। বিষ্ণু ও মহাবলীর স্মরণে ধানের মঞ্জুরী আর ফুল দিয়ে বানানো হয় ছোট ছোট শঙ্কু -- ত্রিক্কাকারা আপ্পান। তারপর সবাই মিলে অদ্ভূতভাবে হর্ষধ্বনি ক'রে থাকেন, যার নাম আরাপ্পু ভিলুকুক্কাল। এটি থিরুওনামের সূচনা বোঝায়। এরপর স্নান ক'রে নতুন জামাকাপড় পরে ঈশ্বরের কাছে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পালা। আর দুপুরবেলা পরিবারের সবাই একত্রিত হ'য়ে মহাভোজ -- ওনাসাদিয়া। আমি

এবছর একটি পরিবারে নিমন্ত্রিত হিসাবে গিয়েছিলাম। এগারো-বারো রকম পদের সঙ্গে পায়েসের বৈচিত্র্য লক্ষ্যনীয়। মাদুরে বসে কলাপাতায় খেতে খেতে গ্রামের বিয়েবাড়িতে বসে খাওয়ার অভিজ্ঞতা মনে আসে। পার্থক্য একটাই এখানে আনন্দ কলরব অপরিচিত ভাষায়। খেতে খেতে সে গল্প-গুলতানিতে যোগ দিতে আমার সম্বল ইংরাজী।

বিকেলের দিকে হয় খেলাধুলো। যার নাম ওনাকালিকল। এর মধ্যে দড়ি টানাটানি, কুস্তি, তীরন্দাজী, কুট্টুকুট্টু (কেরালায় কাবাডি) প্রভৃতি থাকে। সম্ভবতঃ মহাভোজের পর শক্তি পরীক্ষার আসর এটা। আর সন্ধ্যের পর আলোয় সেজে ওঠে বাড়িগুলো। আতশবাজির রোশনাইয়ে ভরে যায় রাতের আকাশ। দীপাবলীর কথা মনে পড়ে যায়। কিন্তু যখনই শুনি কেউ 'পাটাসু' (পটকা) জ্বালাচ্ছে, তখনই ফিরে আসতেই হয় ওনামে।

এই হল কেরালার ওনামের একটা মোটামুটি ছবি। নতুন প্রজন্মের চোখে ওনাম একটু অন্যরকম। তারা অন্যভাবে দেখতে চায়। কথা হচ্ছিল ন্যাশনাল ইনস্টিউট অফ টেকনোলজি কালিকট (আমার কলেজ)-এর আর্কিটেকচারের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র অরবিন্দ রাজের সঙ্গে। অরবিন্দ ওনামের নতুন ব্যাখ্যায় একটা তথ্যচিত্র বানাচ্ছেন। তাঁর মতে ওনাম যেহেতু ফসল ঘরে তোলার উৎসব, তাই এটাকে দেখা যেতে পরবর্তী মরশুমের প্রস্তুতি হিসাবে। নৌকাদৌড় থেকে আরম্ভ ক'রে মহাভোজ -- সবেতেই মানুষকে এক সুতোয় গাঁথার চেষ্টা। প্রাচীন গোষ্ঠী নেতারা একতা ধরে রাখতেই এই উৎসবের প্রচলন করেছিলেন। সেই একতা এখন কেমন? অরবিন্দ হতাশ। নেই। নিউক্লিয়ার পরিবারের বাইরে ও শব্দটির অস্তিত্ব কই? তবে অরবিন্দ যাই বলুন না কেন, মানুষের স্বাভাবিক আবেগে আর লোকগাথায়, ফুলে আর প্রকৃতির অকৃপণ অনুকম্পায় ওনাম আজও অনন্য।

*[লেখক পরিচিতি : রোহণ কুদ্দুস মূলতঃ কবি। 'সৃষ্টি' ওয়েবম্যাগাজিনের সম্পাদক রোহণ কেরালার ন্যাশনাল ইনস্টিউট অফ কালিকট-এ ইলেকট্রনিক্স এ্যান্ড কমিউনিকেশন শাখায় অন্তিম বর্ষের ছাত্র।]*

The Cat Family: Eleena Ghosh

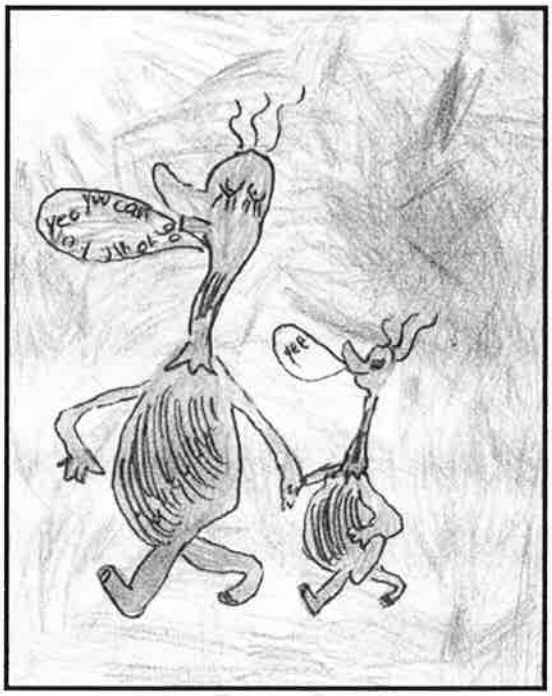

Walking Together: Esha Mukherjee